ISSN 1813-0372

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : **এপ্রিল-জুন** : ২০১৩

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

বিপণন বিভাগ : ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর সম্মানীত সদস্যবৃন্দ, লেখক ও গবেষকবৃন্দ, ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, সংস্থার ফোন নাম্বার বদল হয়েছে। বর্তমান নাম্বার : ০২-৯৫৭৬৭৬২

সংস্থার ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে web: www.ilrcbd.org ভিজিট করুন এবং মতামত দিন।

সম্পাদকীয়

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে না। তাই একজন মুসলিমকে তার প্রতিটি কর্ম ও আচরণের পূর্বে জেনে নিতে হয়, তিনি যে কর্ম বা আচরণটি করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা কী? জীবনে চলার পথে মানুষকে অতি সামান্য থেকে বহু জটিল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। সেই সব অবস্থায় একজন মুসলিম ইসলামের আলোকেই তার করণীয় কাজটি করে থাকেন। 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নাল তার যাত্রার শুরু থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামী আইনের সঠিক জ্ঞান, তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে আসছে। ৩৪তম সংখ্যায়ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

আমাদের দেশে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বিশেষত যারা ভুক্তভোগী, কোর্ট-কাচারীর আঙ্গিনায় ঘুরতে ঘুরতে যারা ক্লান্ত তারা দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি চান। অন্যায্য কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হলে নাগরিকদের অধিকার খর্ব হয়, অন্যদিকে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত হয়। বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু নীতি ও শর্ত আছে। 'শরীয়া আইনে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি এবং তার নীতিমালা ও শর্তাবলি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে।

জীবিকার জন্য ইসলাম মানুষকে যে সকল পন্থা অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছে, তার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য অন্যতম। তবে ইসলাম সব ধরনের ব্যবসার অনুমতি দেয় না। এক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট বিধি-বিধান আছে। ' ইসলামের আলোকে নিষিদ্ধ ব্যবসায় : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামের প্রবন্ধে লেখক বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের উৎকর্ষে মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক দেহ থেকে অপর দেহে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদিকে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, অপর দিকে বিপন্ন একটি জীবনের সংরক্ষণ এ দু'য়ের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ আইনগত দ্বিধায় নিপতিত। "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর ও সংযোজন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি" শিরোনামের প্রবন্ধটি এ বিষয়ের দ্বিধা ও সংশয় অনেকটা দূরীভূত করতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

‘হিবা’ একটি ইসলামী পরিভাষা। বাংলায় আমরা যাকে বলি- দান করা, উপহার দেয়া, আরবিতে তাকেই বলে ‘হিবা’। আদিকাল থেকেই মানব সমাজে হিবার প্রচলন আছে। রসূলুল্লাহ স. হিবা-এর ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। একজন মুসলিম তার প্রিয়জনকে কোন কিছু দান করতে পারে, হাদিয়া তথা উপহার-উপঢৌকন দিতে পারে; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আছে। একজন মুসলিমকে তা জানতে হয়, ‘ইসলামী আইনে হিবা’ শিরোনামের প্রবন্ধে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে একজন মুসলিমের প্রতিনিয়ত ইসলামী বিধি-বিধান জানার প্রয়োজন হয়। আর তা জানা যায় ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে। বাংলাদেশের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন স্তরে ফিকহ বিষয়টি পাঠ্যসূচির অন্ত র্ভুক্ত। এ সংক্রান্ত একটি বিবরণভিত্তিক প্রবন্ধ ‘ইসলামী ফিকহ অধ্যয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ” শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

আধুনিককালে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে বীমা একটি অন্যতম ব্যবস্থা। অতীতে এ জাতীয় ব্যবস্থাপনা ছিল না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই একজন মুসলিম জানতে আগ্রহী, বীমা কতটুকু ইসলাম সম্মত এবং তা কিভাবে ইসলামীকরণ করা যায়? ‘ইসলামে বীমা ব্যবস্থা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে আগ্রহ কিছুটা মেটাতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই গর্ভপাত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এর ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ আতংকিত হয়ে পড়েছেন। “ইসলামী আইনে গর্ভপাত” শিরোনামের প্রবন্ধটিতে এ সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

মোটকথা জার্নালটির এ সংখ্যায় যে প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়েছে, বিষয় হিসেবে তার সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধকারগণ গবেষণার রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। আশা করি লেখাগুলোর মধ্যে পাঠকগণ কিছু নতুন বিষয়ের দিকনির্দেশনা এবং কিছু প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

-ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

শরীয়া' আইনে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি : নীতিমালা ও শর্তাবলি

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*

[**সারসংক্ষেপ :** *দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সুবিচার পাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। কোনো কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হলে মানুষের এ অধিকার প্রাপ্তিও বিলম্বিত হয়। ফলে নাগরিক হিসেবে একদিকে যেমন সে অধিকার বঞ্চিত থাকে, অন্যদিকে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত হয়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে ও সুবিচার পাওয়ার অধিকারকে ত্বরিত প্রাপ্তির স্বার্থে বিচার কার্যক্রম স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে দ্রুত বিচার, শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে দ্রুত বিচার, আল-কুরআনের সামষ্টিক নীতিমালা, দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিবেচ্য মূলনীতিসমূহ, মহানবী স.-এর সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিয়ামের অভিমত, মাসালিহ মুরসালা, সাদ্দুয যারায়ি, সম্পূরক ফিকহী কায়িদা, মাকাসিদুশ শরীয়া, বিচার বিলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ, দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাবলি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

মানুষ স্বভাবগত দিক থেকে অধীর প্রকৃতির। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তাদের এ স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেন : وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً "মানুষ অতিমাত্রায় ত্বরাপ্রবণ।"[১] ইসলামী শরীয়ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব বা ফিতরাতকে বিবেচনায় এনেছে। যাদের জন্য এ বিধান তাদের মানসিক অবস্থা মূল্যায়ন করায় স্থান-কালের বিবেচনা এখানে গৌণ। এ কারণেই শরীয়া আইন সর্বকালের, সর্বযুগের ও সব জাতি-গোষ্ঠীর উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। এর সার্বজনীনতা ও উপযোগিতা হাজার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত। বিচার প্রক্রিয়া ও বিচারব্যবস্থার ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে এক বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা। মহানবী স. নিজে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফাগণও বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন এবং বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন। ইসলামী বিচারব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া ও জুলুমের প্রতিরোধ করা কেবল ইসলামী আইনের

---

* পিএইচ. ডি. গবেষক, ফিক্হ ও উসূল আল-ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া।
[১] আল-কুরআন, ১৭ : ১১

উদ্দেশ্যই নয়, বরং স্বয়ং ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠারও উদ্দেশ্য। তাই ইসলামী বিচারব্যবস্থায় দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। উম্মতের স্বার্থ রক্ষার্থে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের (মাকাসিদুশ শরীয়া) সাথে সঙ্গতি রেখে মাসালিহ মুরাসালাহ (সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা)কে বিবেচনায় এনে ইজতিহাদ করা ও তা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। শরীয়তে অসমর্থিত নয় এমন সব বিষয় মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হলে ইসলামী আইন সেসব বিষয়কে অবশ্যই সমর্থন জানায়। বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনে পৃথক আইন প্রণয়ন তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যথাসম্ভব দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করা আধুনিক বিচারব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। সিভিল বিচারব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে দ্রুত বিচার বলতে সাধরণত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তি করাকে বুঝায়। মামলা দায়ের থেকে রায় ঘোষণা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই দ্রুত গতিতে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়। তবে প্রচলিত দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ঐসব মামলাই স্থানান্তর করা হয় যা জনগুরুত্বপূর্ণ, যার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ, আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন জড়িত এবং যার বিচারকার্য বিলম্বিত হলে আরো ক্ষতির আশংকা আছে। বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করা ও তার রায় দ্রুত বাস্তবায়ন করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে : (এক) যিনি মজলুম বা নিপীড়িত তিনি দ্রুত জুলুম থেকে মুক্তি পান; (দুই) জালিম বা অত্যাচারীর জুলুম দ্রুত রোধ করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া যেসব অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে সমাজ-সভ্যতা তথা রাষ্ট্রের উপর পড়ে, তার বিচার দ্রুত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্রুত বিচার

দ্রুত বিচার শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই স্বভাবতই মনে হয়, কোনো মামলার বিচার কার্য দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করাই দ্রুত বিচার। শরীয়া আইনের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ তথা পূর্বসূরী আলিমগণ (মুতাকাদ্দিমীন)[২] প্রণীত ফিক্‌হের

---

[২] কালপরিক্রমার দিক থেকে ইসলামী আইন বিশারদ মুজতাহিদগণকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়: ১. মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বসূরী), ২. মুতাআখ্‌খিরীন (উত্তরসূরী) ও ৩. মুআ'সিরীন (সমসাময়িক)। কিন্তু এ তিন শ্রেণির মুজতাহিদের সময়ের ব্যাপ্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে মুতাকাদ্দিমীন বলা হয়, ইসলামের প্রথম যুগের ফকীহগণকে যারা ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০হি.], আবূ ইউসুফ [১১৩-১৮২হি.] ও মুহাম্মদ [১৩১-১৮৯হি.]-এর সাক্ষাৎ বা যুগ পেয়েছেন। যারা তাঁদের সাক্ষাৎ বা যুগ পাননি তারা মুতাআখ্‌খিরীন। কারো কারো মতে, হিজরী ৩য় শতাব্দির পূর্বের ফকীহগণ মুতাকাদ্দিমীন এবং এর পরের ফকীহগণ মুতাআখ্‌খিরীন। কেউ কেউ মনে করেন, শামসুল আইম্মা আল-হালওয়ানী [মৃ. ৪৫৬হি.] থেকে মুতাআখ্‌খিরীনের যুগ শুরু। মুতাআখ্‌খিরীনের যুগের বিস্তৃতি নিয়েও মতভেদ রয়েছে, তবে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী হাফিজ উদ্দীন আল-বুখারী [৬১৫-৬৯৩হি.] পর্যন্ত

গ্রন্থাবলীতে দ্রুত বিচারের কোনো সংজ্ঞা বিদ্যমান নেই। একইভাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত "দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২"(২০০২ সনের ২৮ নং আইন)ও দ্রুত বিচারের কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি।[৩] তবে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিশ্লেষণ করে দ্রুত বিচারের সংজ্ঞায়ন করা যেতে পারে এভাবে- "গুরুত্ব, প্রয়োজন ও জনস্বার্থ বিবেচনায় যেসব মামলার বিচার সম্পন্ন হতে বিলম্বিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, বাদী-বিবাদীর কল্যাণ সাধন, জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার শর্তে সেসব মামলার বিচার কার্যক্রম যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।"

উপরোক্ত সংজ্ঞার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন :

ক. মামলাটি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়া। অর্থাৎ মামালার সাথে জনসাধারণ, দেশ বা ব্যক্তির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট জরুরী বিষয় সম্পৃক্ত হওয়া।

খ. গুরুত্ব ও প্রয়োজনের বিপরীতে মামলার বিচার কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকা।

গ. মামলায় বাদী-বিবাদীর কল্যাণ বাস্তবায়ন, জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্য থাকা।

ঘ. ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ. সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তি করা।

শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে দ্রুত বিচার

বিচারের মূল উদ্দেশ্য মামলার রায় প্রদান করে বাদী-বিবাদীর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি করা। স্বাভাবিকভাবেই যত দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা যায় ততই উভয় পক্ষের জন্য তা কল্যাণকর। এতে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রতিক্ষার অবসান হয় এবং অত্যাচারীর শাস্তি ত্বরিত হয় এবং অত্যাচারও বন্ধ হয়। কিন্তু ত্বরিৎ গতি অবলম্বন অর্থ শুনানী, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি

এ সময়কাল। অতএব তাঁর পরবর্তী যুগকে আধুনিক যুগ হিসেবে নামকরণ করা যায়। (আহমদ সাঈদ আল-হাওয়াঈ, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবিল ইমাম আবী হানীফাহ আন-নু'মান*, জিদ্দা : দারুল আন্দালুস আল-খাদরা, ২০০২, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪)। মালিকী মাযহাবের দৃষ্টিতে ইমাম ইব্ন আবূ যাইদ আল-কায়রাওয়ানীর [৩১০-৩৮৬হি.] পূর্বের ফকীহগণ মুতাকাদ্দিমীন এবং তাঁর পরের ফকীহগণ মুতাআখ্খিরীন। শাফিঈ' মাযহাবের মতে আল-বাকিল্লানীর [মৃ. ৪০৩হি.] পূর্বেকার ফকীহগণ মুতাকাদ্দিমীন এবং তাঁর পরের ফকীহগণ মুতাআখ্খিরীন। হাম্বালী মাযহাবের দৃষ্টিতে কাযী আবূ ইয়ালা আল-ফাররার [৩৮০-৪৫৮হি.] পূর্বেকার ফকীহগণ মুতাকাদ্দিমীন, এ থেকে ইবন কুদামাহ আল-মাকদিসীর [৫৪১-৬২০হি.] পূর্বেকার ফকীহগণ মুতাওয়াস্সিতীন এবং তাঁর পরের ফকীহগণ মুতাআখ্খিরীন

৩. প্রণয়নের তারিখ : ১ ডিসেম্বর, ২০০২; দ্র. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=896.

সীমিত করা বা এড়িয়ে যাওয়া নয়, বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার শর্তে বিচারক কোনো প্রকার গড়িমসি না করে যত দ্রুত সম্ভব বিচারকার্য শেষ করাই দ্রুত বিচার।

শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে বিচার দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সাধারণ নীতি। বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া একটি বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া বিচারকার্য বিলম্বিত করা বিচারকের জন্য অনুমোদিত নয়। পূর্বসূরী আলিমগণ বিশেষত যারা ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন বা বিচারব্যবস্থার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা বিলম্বিত বিচারের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামী আইনে দ্রুত বিচারই কাম্য।

আল-কুরআনের সামষ্টিক নীতিমালা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিচার বিষয়ক যেসব আয়াত রয়েছে তাতে বিচারকার্যের কোনো সময় সীমা বেধে দেয়া হয়নি। বরং বিচারের মৌলিক উপাদান ও ধরন নির্ধারণ করা হয়েছে। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী বিচার হতে হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ এবং এ ন্যায়ের মানদণ্ড হলো, আল্লাহর দেয়া বিধান এবং রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ। মহান আল্লাহ মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই বিচারের এই একই মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন। মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আসমানী কিতাবসমূহ নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং তা নবী-রসূলগণের মুখ্য দায়িত্ব। সূরা আল-মাইদার ৪২ থেকে ৫০ আয়াতে মূসা আ.-এর উম্মাত ইয়াহুদী ও ঈসা আ.-এর উম্মাত নাসারাদের বিচারব্যবস্থা উল্লেখ করে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের বিচারিক মূলনীতি ছিলো আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব তথা তাওরাত ও ইনজীল। একই সাথে আল্লাহ মহানবী স. কে কুরআন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী :

فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।"[৪]

অত্র আয়াতে বিচারপ্রার্থী ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। একান্তই তাদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করার জন্য মহানবী স.-এর কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি তার মীমাংসা করেও দিতে পারেন অথবা তাদের উপর ছেড়েও দিতে পারেন।

[৪] আল-কুরআন, ৫ : ৪২

আয়াতে বর্ণিত فاحكم শব্দের শুরুতে ف বর্ণটি শর্তের প্রতি উত্তরে (جواب الشرط) এসেছে। সাধারণত নির্দেশসূচক শব্দের শুরুতে শর্তের জওয়াব হিসেবে 'ফা' বর্ণ ব্যবহৃত হলে উক্ত নির্দেশ দ্রুততার সাথে পালন করার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখনই তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো।"[৫]

শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে বিচারের মূল অবস্থা যেহেতু মামলা দ্রুত নিষ্পন্ন করা, সেহেতু এ বিষয়ক আয়াত দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা তথা দ্রুত বিচারকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এ কারণেই হানাফী মাযহাবের জমহুর (অধিকাংশ) আলিমের মতে বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করা ফরয এবং ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে ওয়াজিব।[৬]

হাদীসের বাণী

বিচারব্যবস্থা বিষয়ে বর্ণিত সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে যেসব মোকদ্দমা উপস্থাপিত হতো তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে তার মীমাংসা করে দিতেন। অবশ্য কোনো কোনো সময় সার্বিক পরিস্থিতি, মামলার ধরন, অপরাধীর অবস্থা ও জনকল্যাণ বিবেচনা করে বিচারের রায় বিলম্বে কার্যকর করা হতো। যেমন তিনি যেনার অপরাধে অপরাধী এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর শাস্তি কার্যকর করণে বিলম্বিত করেন।[৭] বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত সুন্নাহ থেকেই মূলত আজকের দ্রুত বিচারের ধারণার জন্ম। এ প্রসঙ্গে তাৎক্ষণিক বিচারের প্রমাণ সম্বলিত দু'টি হাদীস আমরা উল্লেখ করতে পারি।

(এক) ইমাম বুখারী র. (১৯৪-২৫৬হি.) কা'ব ইব্ন মালিক রা. (মৃ. ৫০/৫১হি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায় কা'ব ইবন মালিক রা. আবূ হাদরাদকে মসজিদে নিজ পাওনার জন্য তাগাদা দিলেন। এতে উভয়ের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ স. তাঁর ঘর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর হুজরার পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন এবং কা'ব ইব্ন মালিক রা.-কে ডেকে বললেন, হে কা'ব! কা'ব রা. বললেন, আমি হাযির, হে আল্লাহর রসূল! তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক মওকুফ করে দাও। কা'ব

---

[৫] আল-কুরআন, ৬২ : ৯

[৬] মুহাম্মদ আমীন ইব্ন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা হাশিয়্যাতি দুররিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯২, খ. ৫, পৃ. ৫৫০

[৭] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মান ই'তিরাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা, অনুবাদ: মাওলানা আলফাতুন কায়সার, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২, খ. ৬, পৃ. ১২৭-১৩২ হাদীস নং ৪২৮৩, ৪২৮৪ ও ৪২৮৫

বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তাই করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ স. (ইব্‌ন আবূ হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।'[৮]

(দুই) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর রা. (মৃ. ৭৩হি.) বলেন:

জনৈক আনসারী মহানবী স.-এর সামনে যুবাইর রা.-এর সঙ্গে খেজুর বাগানে সরবরাহের জন্য হাররার নালার পানি প্রবাহ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। আনসারী বললো, নালার পানির প্রবাহ ছেড়ে দিন। কিন্তু যুবাইর রা. তা অস্বীকার করেন। তারা দু'জন মহান্‌বী স.-এর সামনে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে রসূলুল্লাহ স. যুবাইর রা.-কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার ভূমিতে পানি সরবরাহের পর তা তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এ কথায় রসূলুল্লাহ স.-এর চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিতে পানি দাও, অতঃপর পানি আটকিয়ে রাখো, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবাইর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে: "কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে"।[৯]

---

[৮] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আস-সুলহ, অনুচ্ছেদ : সুলহ বিদ দাইনি ওয়াল 'আইনি, হাদীস নং ২৫২৯, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৫, পৃ. ৪০

أنه تقاضى لبن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال (يا كعب) فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (قم فاقضه)

[৯] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : সাকয়িল আনহার, হাদীস নং ২২০৪, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩, খ. ৪, পৃ. ১৮৯

أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিবেচ্য মূলনীতিসমূহ

মামলার বিচার কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিশ্বব্যাপী প্রচলিত 'দ্রুত বিচার' দাবি মূলত শরীয়া আইনে বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা থেকেই গৃহীত। শরীয়া আইনে দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রে যেসব মূলনীতি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হলো :

মহানবী স.-এর সুন্নাহ (হাদীস)

মহানবী স. বলেছেন :[১০]

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام

"ইসলামে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত করাও যাবে না"।

হাদীসে বর্ণিত ضَرَرَ ও ضِرَارَ শব্দদ্বয়ের অর্থ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, উভয়ের অর্থ একই। গুরুত্ব বুঝানোর জন্য শুধু দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত ভিন্নতা রয়েছে। ইব্‌ন রজব (১৩৩৬-১৩৯৬খ্রি.) চমৎকারভাবে এই ভিন্নতা দেখিয়েছেন: ضَرَرَ অর্থ নিজ থেকেই অন্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং ضِرَارَ অর্থ কারো অনিষ্ট প্রতিহত করতে গিয়ে তার ক্ষতি করা। অর্থাৎ কেউ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার জবাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।[১১]

ইব্‌ন ফারহুন (মৃ. ৭৯৯হি.) বলেন, ضرر অর্থ এক প্রতিবেশী কর্তৃক অন্য প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধন করা এবং ضرار অর্থ উভয়ে উভয়ের অনিষ্ট সাধন করা।[১২] অতএব হাদীসটির অর্থ হবে, "ইসলামে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও পরস্পর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই"। এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কারো যে কোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে এ হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব। বাদী যদি অন্যায়ভাবে বিবাদীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে তখন দ্রুত বিচারের মাধ্যমে বিবাদীর অনিষ্ট অতি দ্রুত রোধ করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি অপরাধী হয় তবে বাদীর অধিকার দ্রুত আদায়ের মাধ্যমে তার থেকে অনিষ্ট প্রতিহত করা যায়।

ইমাম আশ-শাতিবীর (মৃ. ৭৯০হি.) মত অনুযায়ী এ হাদীসটি এমন বিস্তৃত মূলনীতি দান করে যা আইনের যে কোনো অধ্যায়ে প্রযোজ্য। এ কারণে আলিমগণ এ

---

১০. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', কায়রো : দারুল হারামাইন লিত তাবাআতি ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', ১৯৯৭, খ. ২, পৃ. ৭৪, হাদীস নং ২৪০০

১১. ইব্‌ন রজব আল-হাম্বালী, *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ফী শারহি খামসিনা হাদীসান মিন জাওয়ামি'ইল কিলাম*, দামিশক : দারু ইব্‌ন কাসীর, ২০০৮, পৃ. ৩৭০, হাদীস নং ৩২

১২. ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ফারহুন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম ফী উসূলিল আকদিয়্যাহ ওয়া মানাহিজিল আহকাম*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৮৬, খ. ২, পৃ. ৩৪৮

মূলনীতিকে বিশেষ কোনো বিধানের জন্য নির্দিষ্ট না করে শরীয়া আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক নির্দেশনা প্রদানকারী মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৩]

সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর অভিমত

সাহাবীগণের অভিমত (قول الصحابي) শরীয়া আইনের অন্যতম সম্পূরক উৎস। চার ইমামের প্রত্যেকেই সাহাবীর বাণীকে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। খুলাফায়ে রাশিদুন ও মুয়াবিয়া রা. (মৃ. ৬০হি.)-এর খিলাফতকালে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ পরিসরে দু'টি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য:

(এক) উমর রা.-এর খিলাফতকালে তিনি এ বিষয়ক বিশেষ নীতি প্রণয়ন করেন। তিনি আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ রা. (মৃ. ৯১হি.)-কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন:

اكفني بعض الأمور (يعني صغارها) فكان يقضي في الدرهم والدرهمين

"আমার পক্ষ থেকে কিছু কাজ সম্পন্ন করো (অর্থাৎ ছোট-খাট কাজ)। অতঃপর তিনি এক-দুই দিরহামের (মূল্যমানের মামলাগুলো) ব্যাপারে ফয়সালা করতেন।"[১৪]

এ থেকে নির্দিষ্ট বিচারপতির অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও তাতে বিচার্য মামলার ধরন নির্দিষ্ট করার ইঙ্গিত রয়েছে।

মু'আবিয়া রা.-এর কাছে লিখিত পত্রে উমর রা. বলেন:

تعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه

"যার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি (অভিযুক্ত), তার ব্যাপারটি দ্রুত দেখবে। কেননা তার বন্দিত্ব দীর্ঘায়িত হলে সে অধিকার বঞ্চিত হবে।"[১৫]

উমর রা. সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রম হিসেবে বিবাদীর অধিকার বা প্রমাণ অনুপস্থিত থাকলে বিচার কাজ বিলম্বিত করার বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। আবূ মূসা আল-আশআরী রা. (মৃ. ৪২হি.) বরাবর প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেন:

من ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه

"কেউ অজানা বা অদৃশ্য অধিকার বা অস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনের দাবি করলে তাকে অবকাশ প্রদান করো যতক্ষণ না (নির্দিষ্ট মেয়াদ) অতিবাহিত হয়।"[১৬]

---

[১৩] ইবরাহীম ইবন মূসা আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিল ফিকহ*, বিশ্লেষণ : আবূ উবায়দা ইবন হাসান আলি সুলাইমান, আল-কাহেরা : দারু আফ্‌ফান, ১৯৯৭, খ. ৪, পৃ. ৭০।

[১৪] হাফিয নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়াইদ*, অধ্যায় : ইস্তিনাবাতিল হাকিম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮, খ. ৪, পৃ. ১৯৬, হাদীস নং ৭০০৮ ও ৭০০৯

[১৫] মুহাম্মদ রাওয়াস কালআজী, *মাওসূ'আতু ফিক্‌হি 'উমার ইব্‌নিল খাত্তাব*, বৈরূত : দারুন নাফাইস, ১৯৮৯, পৃ. ৭২৬

[১৬] ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর, *মুসনাদ আল-ফারূক ওয়া আকওয়ালুহু আলা আবওয়াবিল ইলম*, বিশ্লেষণ: আব্দুল মু'তী আমীন কাল'আজী, আল-কাহেরা : দারুল ওয়াফা, ১৪১১, খ. ২, পৃ. ৫৭৪

(দুই) জামাল ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মু'আবিয়া রা. যখন দেখলেন যে, মানুষের মধ্যে নরহত্যা ও রক্তপাতের প্রবণতা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে এবং আহত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি তৎকালীন মিসরের বিচারপতি সুলাইম ইব্‌ন 'আত্তার (মৃ. ৭৫হি.)-কে "আহতদের বিচার" (قضاء الجراح) নামে বিশেষ একটি ট্রাইবুনাল গঠন করে তাদের বিষয়ে ফয়সালার নির্দেশ দেন।[১৭]

অতএব সাহাবীগণের এ পন্থা অবলম্বন করে বর্তমান সময়ের অসংখ্য নতুন নতুন অপরাধ প্রবণতা রোধকল্পে দ্রুত বিচারের ট্রাইব্যুনাল গঠন শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয র. বলতেন:

يحدث للناس من القضاء قدر ما أحدثوا من الفجور

"মানুষের অপরাধ সংঘটনের মাত্রা অনুযায়ী তাদের জন্য বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।"[১৮]

মাসালিহ্ মুরসালাহ্

মাসালিহ মুরসালাহ আইনের সম্পূরক উৎসসমূহের অন্যতম। ইমাম আশ-শাতিবী এর বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মাসালিহ্ মুরসালাহ্ বলা হয় ঐসব বৈশিষ্ট্যকে যা শারীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলীল নেই। অথচ তাকে বিবেচনায় এনে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের উপকার হয় অথবা তাদের থেকে ক্ষতি প্রতিহত হয়।"[১৯]

দ্রুত বিচার আদালতের মাধ্যমে মানুষের উপকার হয় এবং ক্ষতি দূরীভূত হয়। আবার এর পক্ষে-বিপক্ষে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কোনো দলীল বর্ণিত হয়নি। অতএব একে বিবেচনায় এনে এর অনুমোদন দেয়া হলে মানবজাতির জন্য তা কল্যাণকর। ইমাম ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১হি.) বলেন:

قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له

"পবিত্র ও মহিমাময় আল্লাহ তাঁর প্রণীত বিভিন্ন বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তা হলো, তাঁর বান্দাদের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষকে

---

[১৭] মূসা ইবন আলী মূসা ফাকিহী, আল-কাদা আল-মুসতা'জাল ফী নিজামিল মুরাফা'আতিস সা'উদী ওয়া সিলাতিহি বিল ফিকহি ওয়া উসূলিহি, *মাজাল্লাতু আল-'আদল*, রিয়াদ : আইন মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদী আরব, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৫, মুহাররাম ১৪২৬, পৃ. ৯৫; ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, রাফ'উল ইসর আন কুদাতি মিসর, খ. ২, পৃ. ২৫৪

[১৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল বাকী আয্-যারকানী, *শারহুয যারকানী আলা মুআত্তা আল-ইমাম মালিক*, বিশ্লেষণ: তাহা আব্দুর রউফ সা'দ, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দীনিয়্যাহ, ১৪২৪, খ. ১, পৃ. ৬৭৬

[১৯] আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২; *আল-ই'তিসাম*, মিসর : আল-মাকতাবাতুত তুজ্জারিয়্যাতিল কুবরা, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১১১

ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করা। অতএব যে পদ্ধতিতেই ন্যায়-ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাই দীনের অংশ, তা দীন বিরোধী নয়।"[২০]

শায়খ আহমদ যারকা (মৃ. ১৩৫৭হি.) দেখিয়েছেন, কল্যাণচিন্তামূলক ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিধি-বিধান দুই প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো, আজকের দিনের বিভিন্ন বিচার ট্রাইব্যুনাল।[২১]

সাদ্দুয যারায়ি'

সাদ্দুয যারায়ি' (سد الذرائع) পরিভাষাটির শাব্দিক অর্থ, 'উপায়-উপকরণ রুদ্ধকরণ', বন্ধকরণ। এটি শরীয়া আইনের একটি সূত্র। ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন: منع كل وسيلة مباحة، قصد بها التوسل إلى مفسدة أو لم يقصد، إذا أفضت إليها غالبا وكانت مفسدتها أرجح من مصلحتها.

"এমন বৈধ উপায়-উপকরণ রুদ্ধ করা, যা দ্বারা ক্ষতিকর কিছু ঘটতে পারে এবং নাও ঘটতে পারে, তবে ক্ষতিকর কিছু ঘটবার আশংকাই অধিক এবং তার ক্ষতিকর দিকটিই উপকার প্রাপ্তির তুলনায় অগ্রগামী।"[২২]

দ্রুত বিচারের অন্যতম উদ্দেশ্য রাষ্ট্র ও জাতির জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড, বিশৃঙ্খলা ও এসবের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপকরণ দ্রুততার সাথে প্রতিরোধ করা। অতএব আইনের সূত্রটিও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

সম্পূরক ফিকহী কা'য়িদা (Legal Maxim)

ফিক্হী কা'য়িদা (সূত্র) ফকীহ্, মুফতী, বিচারক ও শাসকের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার। আইনের সূত্র-এর সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ফকীহগণ দু'টি মতে বিভক্ত হয়েছেন। প্রথম মত অনুযায়ী, এটি এমন এক সামগ্রিক বিষয়, যা তার অধীনস্থ সমস্ত শাখার উপর প্রয়োগ করা হয়।[২৩] দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি সামগ্রিক নয় বরং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধান বা অধিকতর প্রভাববিস্তারকারী বিষয়, যা অধিকাংশের উপর প্রয়োগ করা হয়।[২৪]

---

২০. ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফীস সিয়াসাতিশ শার'ঈয়্যাহ*, মিসর : মাতবা'আতুল আদাব, ১৩১৭, পৃ. ১৪

২১. মুস্তাফা আহমাদ যারকা, *আল-ইসতিসলাহ ওয়াল মাসালিহ আল-মুরসালাহ ফিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া ফিকহুহা*, দামিশক : দারুল কালাম, ১৯৮৮, পৃ. ৫০-৫২

২২. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মুআক্কিঈন*, সম্পা.: তাহা আব্দুর রঊফ সা'দ, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩, খ. ৩, পৃ. ১৩৬

২৩. আলী ইবন আহমদ আল-জুরজানী, আত-তা'রীফাত, সম্পাঃ ইবরাহীম আল-আবয়ারী, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪১৩, পৃ. ২১৯

২৪. মুফসির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিখরাজিল আহকামিল ফিকহিয়্যা লিন নাওয়াযিলিল মু'আসিরাহ,* মক্কা : উম্মুলকুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, খ. ২, পৃ. ৪৭৭

ইসলামী আইনবিজ্ঞানের (উসূলুল ফিকহ) গ্রন্থাবলীতে বিচার ও বিচারব্যবস্থা বিষয়ক ফিকহী কায়িদার বর্ণনা এসেছে। এ পরিসরে প্রাসঙ্গিক তিনটি কায়িদা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক : لا يقضي في خصومة قبل أوانها "যথাসময়ের পূর্বে কোনো মামলার বিচার সম্পন্ন হবে না।"[২৫]

এ কায়িদা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দ্রুত বিচার করার জন্য বিচারের মৌল নীতিমালার ব্যাপারে কোনোরূপ শিথিলতার অবকাশ নেই। বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যেসব শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করেই কেবল মামলা নিষ্পত্তি করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

অন্যভাবে বলা যায়, রায় ঘোষণার পূর্বে বিচার্য বিষয়ে কোনো প্রকার মন্তব্য বা ফাতওয়া দেয়া থেকে বিরত থাকা বিচারকের কর্তব্য। কেননা তাঁর এ ধরনের মন্তব্য বিচারকে বাধাগ্রস্ত বা প্রভাবিত করতে পারে এবং তার নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী যে কোনো পক্ষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে কাযী শুরাইহ (মৃ. ১০৭হি.)-এর নিকট বিচার্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, "আমি তোমাদের বিচারের কাজে নিয়োজিত, ফাতওয়া প্রদানের কাজে নই।"[২৬]

দুই : لا يقضي في دعوى بعد فوات أوانها "কোনো মামলার উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে বিচার করা যাবে না।"[২৭]

যথাসময়ের পূর্বে যেমন মামলার বিচার নিষ্পন্ন করা যায় না তেমনি উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও মামলার বিচার করাও সঙ্গত নয়। এ কায়িদাটি স্পষ্টভাবে বিচার কার্যক্রম দ্রুত করার নির্দেশনা প্রদান করে। অন্যভাবে বলা যায়, মামলার বাদী যদি শর'ঈ ওযর ছাড়া দীর্ঘদিন যাবত অনুপস্থিত থাকে এবং মামলার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পর উক্ত মামলা তামাদি ঘোষণা করা হবে।[২৮]

তিন : القضاء يقبل التقييد والتعليق ويتخصص بالزمان والمكان والخصومة

"বিচারের ক্ষেত্রে শর্তারোপ ও সমীক্ষা গ্রাহ্য এবং বিচারকের জন্য বিচারের স্থান, সময় ও মামলা নির্দিষ্ট করা অনুমোদিত।"[২৯]

---

২৫. ইবরাহীম মুহাম্মদ আল-হারীরী, *আল-কাওয়া'ঈদু ওয়াদ-দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ লি-নিজামিল কাদা ফীল ইসলাম*, আম্মান : দারুল আম্মান লিন নাশর, ১৯৯৯, পৃ. ৮৮

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. মুহাম্মদ আমীন ইব্ন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার 'আলা হাশিয়্যাতি দুররুল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১৯

২৮. ইবরাহীম মুহাম্মদ আল-হারীরী, *আল-কাওয়া'ঈদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ লিনিজামিল কাদা ফীল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

২৯. যায়নুদ্দীন ইব্ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাজাঈর আলা মাযহাবি আবী হানীফা আন-নু'মান*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯, পৃ. ১৯৪

বিচারের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ শর্তারোপ করতে হলে শর্তগুলো অবশ্যই শরীয়তসম্মত হতে হবে। বিচারের ক্ষেত্রে এ কায়িদাটি নিম্নোক্তভাবে প্রয়োগ হয়:

- রাষ্ট্র যদি বিচারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নির্ধারণ করে দেয়, তবে সে স্থানেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। এর বাইরে অন্য কোথাও বিচারকার্য সমাধা করলে তা অগ্রাহ্য হবে এবং তার রায় অকার্যকর হবে।
- রাষ্ট্র যদি বিচারের এজলাস বসার দিন বা সময় নির্ধারিত করে দেয়, তবে বিচারক তদনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য।
- একই বিচারালয়ে একাধিক বিচারক থাকলে তাদের মধ্যে কর্ম ভাগ করে দেয়া যেতে পারে। (যেমন একজন দেওয়ানী আদালতে বিচার পরিচালনা করবেন, অন্যজন ফৌজদারী আদালতে বিচার পরিচালনা করবেন)।

এ কায়িদার প্রয়োগ সম্পর্কে উসমানী খিলাফাতের সংবিধান খ্যাত "আল-মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ" এর ১৮০১ ধারায় বলা হয়েছে, "বিচারকে সময়, স্থান ও কিছু মামলার সাথে সম্পৃক্ত করে শর্তারোপ করা যেতে পারে। যেমন বিচারক এক বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি শুধু ঐ বছরের জন্য বিচারের দায়িত্ব পালন করবেন। অতএব উক্ত বছর আসার আগে বা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে বিচারের দায়িত্ব পালন করার এখতিয়ার তার নেই। একইভাবে নির্ধারিত বিষয়ের বিচার করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক শুধু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার পরিচালনা করবেন। অন্য বিষয়ের বিচার করার এখতিয়ার তার নেই। কোনো নির্ধারিত আদালতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক শুধু উক্ত আদালতের আওতায় বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। অন্য কোনো আদালতে বিচার পরিচালনা করার এখতিয়ার তার নেই। যদি রাষ্ট্রীয় ফরমানের মাধ্যমে সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত কারণে ঘোষণা দেয়া হয়, অমুক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কোনো মামলা গ্রহণ করা হবে না, তবে উক্ত মামলা গ্রহণ ও বিচার করার এখতিয়ার বিচাকের নেই। কোনো আদালতের কোনো বিচারপতি যদি নির্দিষ্ট কিছু মামলা পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি শুধু তার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রহণ ও বিচারে দায়িত্ববান হবেন। অন্য বিষয় সংশ্লিষ্ট আর্জি শ্রবণ বা তার বিচার করার এখতিয়ার তার নেই। একইভাবে যদি কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মুজতাহিদের মতামত মানুষের জন্য অধিক কল্যাণপ্রসূ ও বিদ্যমান সময়ের জন্য উপযোগী হওয়ায় শুধু তার মত অনুযায়ী বিচার পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ জারী করা হয় তবে বিচারকের এখতিয়ার নেই যে, তিনি উক্ত মুজতাহিদের মতের বিরোধী অন্য কোনো মুজতাহিদের মত অনুযায়ী বিচার করবেন। তিনি তা করলে তার রায় কার্যকর হবে না।"[৩০]

---

৩০. *আল-মাজাল্লাতুল আহকাম আল-'আদলিয়্যাহ,* বৈরূত : আল-মাতবাআতুল আদাবিয়্যাহ, ১৩০২, পৃ. ২৬২

মাকাসিদুশ শারীয়া

'মাকাসিদুশ শারীয়া পূর্বকালের ও পরবর্তীকালের আলিমগণের নিকট অতি পরিচিত একটি পরিভাষা। তবে পূর্ববর্তী আলিমগণ এর কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি, এমনকি ইমাম আশ-শাতিবীও নন, যিনি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। মাকাসিদুশ শরীয়া শব্দের অর্থ শরীয়ত বা আইনের উদ্দেশ্য। বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শরীয়া প্রণেতা আইন প্রণয়নের বেলায় সাধারণ ও বিশেষ যে উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখেছেন তাকে মাকাসিদুশ শারীয়া বলা হয়।[৩১] এ পরিভাষাটি বোধগম্য করার জন্য অন্যান্য কিছু শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন– মাসলাহা, হিকমাহ, ইল্লাত ইত্যাদি।

ইসলামে বিচারব্যবস্থা ও বিচারকার্যের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মজলুমকে জালিমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা এবং প্রকৃত হকদারকে তার অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়া। দ্রুত বিচার আদালতের উদ্দেশ্যও একই।

ইয্যুদ্দীন ইব্ন আব্দুস সালাম (৫৭৭-৬৬০হি.) বলেন:

الغرض من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين وتوفير الحقوق على المستحقين ... فلذلك كان سلوك أقرب الطرق في القضاء واجبا على الفور، لما فيه من إيصال الحقوق إلى المستحقين ودرء المفسدة عن الظالمين والمبطلين.

"বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত হকদারকে তার অধিকার পৌঁছে দেয়া, তাই যত দ্রুত সম্ভব বিচারকার্য সম্পন্ন করা ও ত্বরিতপন্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। তাতে প্রকৃত হকদারকে অধিকার প্রদান এবং জালিম ও অধিকার খর্বকারীর জুলুমের অবসান করা যায়।"[৩২]

পূর্বসূরী মুসলিম মুজতাহিদ কাযীগণের অভিমত

কারো সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিচারকার্য দ্রুত বা বিলম্বে সম্পন্ন করার ভয়াবহতা উল্লেখ করে কাযী শুরাইহ বলেন: لا يقدم الحكم بالشفاعات، ولا يؤخره لأجلها، فمن فعل ذلك، خفت أن يستوجب عذابا شديدا "কারো সুপারিশের কারণে তড়িঘড়ি রায় দেয়া অথবা রায় বিলম্বিত করা বিচারকের জন্য মোটেও সঙ্গত নয়। যে তা করবে তার ব্যাপারে আমি আশংকা করি যে, সে নিজের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত করে নিলো।"[৩৩]

---

৩১. ড. আহমদ আর্-রায়সূনী, *নাজরিয়্যাতুল মাকাসিদ 'ইনদাল ইমাম আল-শাতিবী*, ওয়াশিংটন : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪১২, পৃ. ৭

৩২. ইয্যুদ্দীন ইব্ন 'আব্দুস সালাম, *কাওয়া'ঈদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম*, বিশ্লেষণ: মাহমুদ ইবন তালামিদ আশ-শানকিতী, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৯০০, খ. ২, পৃ. ৩৫

৩৩. সুলায়মান ইব্ন উমর আল-জামাল, *হাশিয়াতুল জামাল আলা শরহিল মানহাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬, খ. ৫, পৃ. ৩৪৯

ইবনুল কিস (মৃ. ৩৩৫হি.) বলেন:
يجب على القاضي إذا ترافع إليه الخصمان أن يحكم، ولا يجوز ردهما إلى غيره نص عليه، لأن في الرد تأخير الحق
“বিচারকের কাছে বাদী-বিবাদী কোনো মামলা পেশ করলে তার ফয়সালা করা তার জন্য অপরিহার্য। তাদেরকে অন্য কারো কাছে প্রেরণ করা বৈধ নয়, কেননা তাদেরকে অন্যের কাছে পাঠানো অর্থ প্রকৃত হকদারের তার অধিকার ফিরে পাওয়া বিলম্বিত করা।”[৩৪]

বিনা কারণে বিচারকার্যে সময়ক্ষেপণ করার বিধান সম্পর্কে হানাফীগণ কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, বিচারক বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বিচার বিলম্বিত করেন, তবে তিনি কুফরী করলেন। অন্য একদলের মতে, উক্ত বিচারক কাফির হবেন না, তবে বড় ধরনের অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবেন।[৩৫]

অপরাধ ও মামলার ধরন অনুযায়ী পৃথক ট্রাইবুনাল নির্ধারণ ও বিচারক নিয়োগ দেয়া প্রসঙ্গে কাযী আবূ ইয়ালা (৩৮০-৪৫৮হি.) বলেন:
فإن قلد (الإمام) قاضيين على بلد نظرت فإن رد إلى أحدهما ... نوعا من الأحكام وإلى الآخر غيره، كرد المداينات إلى أحدهما والمناكح إلى الآخر فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منهما على النظر في ذلك الحكم
“যদি রাষ্ট্রপ্রধান কোনো এলাকায় দু'জন বিচারক নিয়োগ করেন, আমি মনে করি, যদি তাদের একজনকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং অন্যজনকে ভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়, যেমন একজনকে ঋণ বা আর্থিক লেনদেন বিষয়ে ও অন্যজনকে বিবাহ বা পারিবারিক বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করার দায়িত্ব দেয়া হয়, তবে তা বৈধ। তারা শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিচার করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন।”[৩৬] কাযী আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০হি.) ও একই মত পেশ করেছেন।[৩৭]

আল-কারাবীসী (মৃ. ৫৭০হি.) বলেন: القضاء مما إذا خص اختص به بدليل أنه إذا خص ببلد اختص به فكذلك إذا خص شخص أو نوع اختص به. “বিচারের জন্য কোনো বিশেষ আদালত নির্দিষ্ট করা হলে তা উক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে এ দলীলের ভিত্তিতে যে, যদি কোনো এলাকার জন্য একজন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয় তবে তার কার্যক্রম ঐ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। একইভাবে যদি বিচারের জন্য

---

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. ইব্‌ন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৫০

৩৬. আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইব্‌নুল হুসাইন আল-ফাররা, *আল-আহকাম আস্-সুলতানিয়্যাহ*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০, পৃ. ৬৯

৩৭. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, তা. বি., পৃ. ১২৫

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয় বা বিশেষ আদালত গঠন করা হয় তবে তা তার মধ্যেই সীমিত থাকবে।"[৩৮]

নির্ধারিত কিছু অপরাধের জন্য আলাদা আদালত গঠন প্রসংগে ইব্‌ন নুজাইম (৯২৬-৯৭০হি.) বলেন:

بعض الخصومات القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء

"কিছু নির্ধারিত মামলার বিচারের জন্য নির্দিষ্ট আদালত গঠন এবং স্থান ও সময় নির্ধারিত করা বৈধ।"[৩৯]

বিচার বিলম্বিত করার ক্ষেত্রসমূহ

প্রসংগত ফকীহগণ যেসব কারণে বিচারকার্য বিলম্বিত করা অনুমোদন করেছেন সেগুলো উল্লেখ করা জরুরী। এ সম্পর্কে নিম্নে চার মাযহাবের মতামত তুলে ধরা হলো :

এক : হানাফী মাযহাব

এ মাযহাবের দৃষ্টিতে বিচারক চার কারণে বিচার বিলম্বিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন:[৪০]

(১) বিচারক যদি আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে আরো তদন্তের প্রয়োজন মনে করেন।

(২) বিচারক যদি বাদী-বিবাদী উভয়ের মধ্যে সমঝোতার আশা করেন। বাদী-বিবাদী পরস্পর প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয় অথবা দূরবর্তী যেই হোক একই বিধান প্রযোজ্য।

(৩) যদি বাদী তার দাবির পক্ষে আরো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন বা সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। একইভাবে যদি বিবাদী তার প্রতিরোধ ও নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সময় প্রার্থনা করেন।

(৪) যদি বিচারক বিচার সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উক্ত এলাকার আলিমগণ থেকে ফাতওয়া তলব করেন এবং তাঁদের প্রদত্ত ফাতওয়ার উপর নির্ভর করতে না পেরে অথবা অধিক তথ্য জানার জন্য অন্য এলাকার আলিম থেকে ফাতওয়া গ্রহণ জরুরী মনে করেন, তবে অন্য এলাকার আলিমগণের মতামত আসা পর্যন্ত বিচার বিলম্বিত করতে পারেন।

---

৩৮. আস'আদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কারাবীসী, *আল-ফুরূক*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ তামূম, কুয়েত : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪০২, খ. ২, পৃ. ১৬৪

৩৯. ইব্‌ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আস্-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৯৯৩, খ. ১৬, পৃ. ৬৬, ১১০; ইব্‌ন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৫০; ইব্‌ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

দুই: মালিকী মাযহাব

মালিকী মাযহাবের দৃষ্টিতে শুধু বাদী-বিবাদীর মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা থাকলেই বিচারকার্য বিলম্বিত করা যেতে পারে।[৪১]

তিন: শাফিঈ মাযহাব

এ মাযহাবের দৃষ্টিতে বিচারক যেসব কারণে বিচার বিলম্বিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন তা হলো:[৪২]

(১) বাদী-বিবাদীর মধ্যে সমঝোতা বা সন্ধির আশা থাকলে।

(২) অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচারকে বিলম্বিত করা যেতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক শপথ করার যোগ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাও অনুমোদিত।

(৩) মামলার বিষয় যদি রহস্যাবৃত ও দুর্বোধ্য হয় তবে এর জট খুলে মূল ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিচারকার্য দীর্ঘায়িত করা যায়।

চার: হাম্বালী মাযহাব

এ মাযহাবের দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত কারণে বিচার বিলম্বিত করা যায়:[৪৩]

(১) মামলার তথ্য-প্রমাণ পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন হওয়া পর্যন্ত।

(২) সমঝোতার আশা থাকলে।

(৩) মামলার বিষয় ও প্রকৃত ঘটনা অস্পষ্ট হলে তা রহস্যমুক্ত হওয়া পর্যন্ত।

(৪) বিবাদী শপথ করলে এবং বাদী তা প্রত্যাখ্যান করলে।

(৫) সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে।

---

[৪১] মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আদ-দাসূকী, *আশ্-শারহুল কাবীর মা'আ হাশিয়্যাতিদ দাসূকী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৫২; শিহাবুদ্দীন আহমাদ আল-কারাফী, *আয-যাখীরাহ ফিল ফিকহিল মালিকী*, বৈরূত : দারুল গারব, ১৯৯৪, খ. ১০, পৃ. ৮৫; ইব্ন ফারহূন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২

[৪২] আবু ইসহাক আশ-শীরাযী, *আল-মুহায্যাব ফী ফিকহিল ইমাম আশ-শাফি'ঈ*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আল-যুহাইলী, দামিশক : দারুল কালাম, ১৯৯৬, খ. ৫, পৃ. ৫১৯, ৫২৬; আবুল হাসান তাকীউদ্দীন আলী আস-সুবকী, *ফাতওয়া আস্-সুবকী*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৪৫৯; ইমাম শাফিঈ', *আল-উম্ম*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯০, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১৬; হাশিয়্যাতুল জামাল 'আলা শারহিল মানহাজ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৯

[৪৩] ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মুআক্কীঈ'ন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১০; ইব্ন কুদামা, *আল-মুগনী ফীল ফিকহিল হাম্বালী*, বিশ্লেষণ: আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকী, বৈরূত : দারু 'আলমীল কুতুব, ১৯৯৭, খ. ১৪, পৃ. ২৯-৩০; 'আলী ইব্ন সুলায়মান আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ আলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকী, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১৯৫৬, খ. ১১, পৃ. ২৪৫

দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাবলী

'দ্রুত বিচার' পরিভাষাকে সাধারণ বিচার থেকে পৃথক হিসেবে বিবেচনা করে আলাদা ট্রাইব্যুনাল চালু করলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামী আইনের বিচারব্যবস্থায় সাধারণ নীতিমালাই প্রযোজ্য হবে। কেননা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করাই সাধারণ ব্যবস্থা। শুধু উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিচার বিলম্বিত হতে পারে। ইসলামী আইন অনুযায়ী দ্রুত বিচার কার্যক্রম পরিচালনার যেসব বিশেষ শর্ত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো :

(১) সাধারণ বিচারের ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক উপাদান থাকা ইসলামী আইনে আবশ্যক হিসেবে বিবেচ্য; দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রেও একই উপাদান বিদ্যমান থাকা জরুরী।

(২) সাধারণ ও দ্রুত বিচার আদালতের কার্যপ্রণালী বিধি (Rules of Procedure) অভিন্ন হওয়া।

(৩) নির্দিষ্ট কিছু মামলা নয়, বরং সব ধরনের মামলাকে দ্রুত বিচারের আওতাভুক্ত করা। কেননা দ্রুত বিচার ইসলামী বিচারব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সব ধরনের মামলার বিচার ইসলামী আইন অনুযায়ী করা একান্ত কর্তব্য।[৪৪] কিছু বিচার এ আইনের আওতায় এনে বাকিগুলোর প্রতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেয়া যাবে না। কেননা মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মামলাই ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্ববহ।

(৪) ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার করার বাধ্যবাধকতা ছাড়াও বিচারকের সব ধরনের প্রভাবমুক্ত থাকা।

(৫) ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন হওয়া পর্যন্ত সময় নেয়া। বিচারকের অন্তরে এ সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকা।

(৬) দুই স্তরে বিচারের ব্যবস্থা থাকা। অর্থাৎ এ আদালতের রায় সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ থাকা।[৪৫]

---

[৪৪]. এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ "কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে"। (আল-কুরআন, ৪ : ৬৫)

[৪৫]. বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার দৃষ্টান্ত কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হায়সামী (৭৩৫-৮০৭হি.) সংকলিত "আল-মাজমাউয যাওয়াইদ" শীর্ষক হাদীস গ্রন্থের 'আদ-দিয়্যাত' অধ্যায়ের 'বাবুল কাওমি ইয়াযদাহিমুনা ফাইয়াকাউ বা'দুহুম ফাইয়াতাআল্লাকু বিগাইরিহিম'-এ ইয়ামেনে সিংহ শিকারের জন্য খননকৃত গর্তে পড়ে নিহত হওয়া চার ব্যক্তির রক্তপণ বিষয়ে আলী রা.-এর বিচারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে, নিহত ব্যক্তিগণের কিছু কিছু ওয়ারিস আলী রা.-এর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিধায় হজ্জের মওসুমে তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে পুনর্বিচারের আপিল করেন। তিনি তাদের বক্তব্য শ্রবণ করে আলী রা.-এর ফয়সালাকে বহাল রাখেন। অন্যদিকে আপিল আদালতে প্রথম আদালতের রায় পরিবর্তন করার বৈধতা প্রমাণের জন্য ইমাম আব্দুর রায্যাক (১২৬-২১১হি.) সংকলিত 'আল-মুসান্নাফ'-এর কিতাবুত তালাক-এ 'আল-মারআতানি তাদ্দায়িআনি'

(৭) বাদী-বিবাদী উভয়কে যুক্তি-তর্ক এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের পর্যাপ্ত সময় দেয়া।[৪৬]
(৮) বিচার পক্ষপাতমুক্ত হওয়া অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য একই বিধান হওয়া। কাউকে বাঁচানো আর কাউকে ফাঁসানোর জন্য বিশেষ আইন তৈরি বা আইন পরিবর্তন না করা।[৪৭]

উপসংহার

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার নানামুখী কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামী আইন দান করেছেন। এ আইনে নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বক্ষেত্রে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করাই কাম্য। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই নবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম লক্ষ্য। অত্র প্রবন্ধে এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, ইসলামী আইন সর্বাগ্রে মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার অবকাশ দেয়। অতএব দ্রুত বিচার আইনের ধারণা ইসলামী আইনের মৌলিক বিধানেরই অংশ। যদি এর প্রক্রিয়া, প্রয়োগ পদ্ধতি ও নীতিমালা যথাযথ, ন্যায়সঙ্গত এবং যে কোনো প্রকার অন্যায় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তবে এ জাতীয় আইন মানবতার কল্যাণ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অবদান রাখতে পারে।

শীর্ষক পরিচ্ছেদে দুই নারী কর্তৃক এক সন্তানের মাতৃত্ব দাবি সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। হাদীস অনুযায়ী সন্তানের প্রকৃত মা দাউদ আ.-এর বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে সুলায়মান আ.-এর শরণাপন্ন হয়। তিনি উভয়ের বক্তব্য শুনে দাউদ আ. কৃত ফয়সালা পরিবর্তন করে সন্তানকে তার প্রকৃত মায়ের কাছে ফেরত দিয়েছিলেন

৪৬. ইসলামী আইন অনুযায়ী মামলার সঠিক তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য বাদী-বিবাদী উভয়ের যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল আহকাম'-এর 'বাবু মাওইজাতুল ইমাম লিল খুসুম'-এ উল্লেখ করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে এবং দেখা গেল তোমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বেশি বাকপটু এবং তাদের যুক্তি শুনে আমি তার পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখ, তোমার ভাইয়ের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ কর, তাহলে তুমি দোযখের একটি টুকরা লাভ করলে।" হাদীসটি উল্লেখ করে ইবন আশূর বলেন, এ থেকে প্রমাণিত হয়, সত্য উদঘাটনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। বিচারকের উচিৎ শুনানীর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতিটিই গ্রহণ করা যা সত্য উদঘাটনে সহায়ক হয়"। (মাকাসিদুশ শারীয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮)

৪৭. মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর"। (আল-কুরআন, ৫ : ৮)

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

ইসলামের আলোকে নিষিদ্ধ ব্যবসায় : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ মাসুদ আলম*

[সারসংক্ষেপ : *আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পারস্পরিক লেনদেন বা আদান-প্রদান একটি অপরিহার্য বিষয়। ধাতব মুদ্রা এবং পরবর্তীকালে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হওয়ার পূর্বে মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর আন্তঃবিনিময় করতো। এভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। এটি একটি সামাজিক অপরিহার্য বিষয় হিসেবে ইসলামী শরীয়ত ব্যবসায়-বাণিজ্যকে আইনী অনুমোদন দিয়ে বৈধ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে আয়-উপার্জনের মাধ্যম বলা হয়েছে এবং এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. নিজে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করে বিশ্ববাসীকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এর নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. তাঁর নিকট থেকে প্রদত্ত শিক্ষার আলোকে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করে সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে অবদান রেখেছেন। ইসলামী শরীয়ত ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারি ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে এবং নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ বিবর্জিত ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে ব্যবসায়ের কতিপয় নিষিদ্ধ পদ্ধতি বিশেষত ব্যবসায় পরিচিতি, তিজারাহ, বায়', শিরা, নিষিদ্ধ ব্যবসায়, আল-মুনাবাযা, মুলামাসা, মুযাবানা, মুহাকালা, মুখাবারা, গারার, বায় আলাল-বায়, মুসাররাত, তালাক্কী, নাজাশ, দালালী, মুজুতদারি, হারাম জিনিসের ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।*]

ব্যবসায় পরিচিতি

ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ব্যবসায় এর অর্থ করা হয়েছে যথাক্রমে জীবিকা, বৃত্তি, পেশা, কারবার, যত্ন, উদ্যম, চেষ্টা, অভিপ্রায়, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, অনুসন্ধান, ব্যবহার, আচরণ, সওদাগরি।[১] আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে কুরআন মাজীদে এবং অভিধানে 'তিজারাহ' (تجارة), 'বায়' (البيع) এবং 'শিরা' (الشراء) শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিচে উপরোক্ত পরিভাষাসমূহ আলোচনা করা হলো :

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৫, পৃ. ৯০৯

আত-তিজারাহ (التجارة)

পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসা-এর ২৯ নং আয়াতে যে তিজারাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন- التجارة هى البيع والشراء والتجارة فى اللغة عبارة عن المعاوضة অর্থাৎ তিজারাহ বা ব্যবসায় হচ্ছে, ক্রয়-বিক্রয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে তিজারাহ গড়ে ওঠে বিনিময় থেকে। প্রত্যেক বিনিময় কাজই মূলত তিজারাহ, সে বিনিময় যে কোনো ধরনেরই হোক।[২]

আল-বায়' (البيع)

ইসলামী পরিভাষায় বায়' (البيع) কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

البيع مبادلة المال بالمال بالتراضى

অর্থ: পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতির ভিত্তিতে মালের আন্তঃবিনিময়কে ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায় বলে।[৩]

আশ-শিরা (الشراء)

আশ্-শিরা (الشراء) এবং আল-ইশতিরা' (الاشتراء) উভয় শব্দের অর্থ মূল্যের বিনিময়ে কোনো বস্তু গ্রহণ করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে এর বিনিময়ে"।[৪]

সুতরাং ইসলামের আলোকে আমরা বলতে পারি, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে হালাল পণ্য সামগ্রীর ন্যায়সঙ্গত লেনদেন বা আন্তঃবিনিময়কে ব্যবসায় বলা হয়। উল্লেখ্য, হাদীস ও ফিক্হ-এর কিতাবসমূহে 'কিতাবুল বুয়ূ' বলতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প-উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সব কিছুকেই বোঝানো হয়।

নিষিদ্ধ ব্যবসায়

মহানবী স. তাঁর সাহাবীগণকে পেশা হিসেবে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁদেরকে শিখিয়েছেন ব্যবসায়-বাণিজ্যের নীতিমালা। তাঁরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারি ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ইসলামের আলোকে বিধিবিধান, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ বিবর্জিত ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষিদ্ধ ব্যবসায় হিসেবে পরিত্যক্ত। নিচে নিষিদ্ধ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হলো :[৫]

---

২. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, বৈরূত : দারুল মালাইন, তা. বি., খ. ১৮, পৃ. ৮৮

৩. *আল-কামূস*, বৈরূত : দারু সাদির পাবলিশার্স, ১৪২১, পৃ. ৪৫

৪. আল-কুরআন, ৯ : ১১১

৫. ড. মোঃ মাসুদ আলম, *ইসলামের বাণিজ্য নীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অপ্রকাশিত থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৮৮

(১) বায়' আল-মুলামাসা ও বায়' আল-মুনাবাযা

বায়' আল-মুলামাসা এবং বায়' আল-মুনাবাযা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দু'টি প্রাচীন পদ্ধতি যা জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিলো। এ উভয় পদ্ধতিতে ক্রেতাকে পণ্যদ্রব্যটি দেখেশুনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনো সুযোগ দেয়া হতো না।

'মুলামাসা' (ملامسة) অর্থ স্পর্শ করা। ক্রেতা কোনোরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই কোনো পণ্যদ্রব্য শুধু স্পর্শ করলেই ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের নাম বায়'-আল-মুলামাসা। অন্যদিকে 'মুনাবাযা' (منابذة) অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতার দিকে কোনো পণ্যদ্রব্য ছুঁড়ে মারলে ক্রেতা তা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই ক্রয় করতে বাধ্য হতো, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের নাম হলো 'বায়' আল-মুনাবাযা'।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. আমাদের দু'ধরনের কেনা-বেচা করতে ও দু'প্রকার কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। কেনা-বেচার মধ্যে তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষিদ্ধ করেছেন। 'মুলামাসা' হলো (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) একজন অপরজনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা, রাতে হোক কিংবা দিনে। এরূপ করা ছাড়া (মাল) উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখা হয় না। আর 'মুনাবাযা' হলো, পরস্পর একজনের প্রতি অপরজনের কাপড় ছুঁড়ে মারা এবং এরূপ করলেই ভালোরূপে দেখে শুনে রাযী হওয়া ছাড়াই উভয়ের মধ্যে কেনা-বেচা সম্পন্ন হয়ে যেত"।[৬]

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বায় 'মুলামাসা এবং বায়' মুনাবাযা উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের বিক্রিত জিনিসের যাচাই-বাছাই করার সুযোগ দেয়া হয় না এবং দরকষাকষিরও সুযোগ দেয়া হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয় না। এমন লেনদেনে ভোক্তাস্বার্থ চরমভাবে ব্যাহত হয় অথচ ইসলামের দাবি হলো, লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করা। কোনো একপক্ষের ক্ষেত্রে সুবিধা এবং অন্যপক্ষের ক্ষেত্রে অসুবিধার বিধান ইসলামে অনুমোদিত নয়।

ইসলামের দাবি হচ্ছে, পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা হবে উন্মুক্ত বাজার পদ্ধতিতে, যেখানে ক্রেতাদের স্বাধীনতা থাকবে পছন্দমত পণ্য ক্রয়ের এবং দর-দাম করার। বিক্রেতা কোনোভাবে ক্রেতার অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বা তাকে ঠকিয়ে অধিক মুনাফা করতে

---

৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : ইবতালু বায়িল মুলামাসা ওয়াল মুনাবাযা, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ৯৩৯

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ

পারবে না। এ কারণে 'মুলামাসা' এবং 'মুনাবাযা' উভয় পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী স. "মুলামাসা এবং মুনাবাযা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" [৭]

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়' আল-মুলামাসা ও বায়' আল-মুনাবাযা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এ জাতীয় লেনদেনে ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না, দরকষাকষি করা যায় না এবং পণ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও লাভ করা যায় না।

(২) বায়' আল মুযাবানা ও বায়' আল-মুহাকালা

বায়'-আল-মুযাবানা ও বায়'-আল-মুহাকালা জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়ের অপর দু'টি পদ্ধতি। এ উভয় ধরনের কেনা-বেচা ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে- রসূলুল্লাহ স. 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হলো, গাছের খেজুর সংগ্রহের আগেই মজুদ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর 'মুহাকালা' হলো ক্ষেতের শস্য অনুমান করে সংগৃহীত শষ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং প্রস্তুত করা গমের পরিবর্তে জমি বর্গা দেয়া। উল্লেখ্য যে, সালিম র. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবিত রা.-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আরায়া' শ্রেণির ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তাজা অথবা শুকনো খেজুরের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দান করেছেন। এছাড়া অন্য কোনো ফলের ব্যাপারে তিনি অনুমতি দেননি। [৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ইব্‌ন মুহাজির র. বলেন, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ স. আরায়া পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। 'আরায়া' হলো, নিজ পরিবারবর্গকে তাজা রসাল খেজুর খাওয়ানোর জন্য গাছের ঝুলন্ত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে খরিদ করে রাখা"। [৯]

---

৭. عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة প্রাগুক্ত

৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আনিল মুহাকালা ওয়াল মুযাবানা...., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৪

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু বাইয়ির রুতাব বিততামার ইল্লা ফিল-আরায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৩

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা আল-কা'নাবী র. থেকে সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। "রসূলুল্লাহ স. শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : এটাই সুদ, এটাই মুযাবানা। অবশ্য তিনি আরায়াকৃত দু'একটা খেজুর গাছের বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। বাড়ীর মালিক এর পরিমাণ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রেখে দিবে এবং তাজা ফল খাবে"।[১০]

'মুহাকালা'র বর্ণনা প্রসঙ্গে হাদীসে আরো এসেছে, 'মুহাকালা' হলো ক্ষেতের শস্য নির্ধারিত পরিমাণ গমের বিনিময়ে বিক্রি করা।[১১] মুযাবানা সম্পর্কে আরো জানা যায়, ইবন উমর রা. বলেন, "নবী স. খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে আন্দাজ করে এবং আঙ্গুরকে কিশমিশের বিনিময়ে আন্দাজ করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্ষেতের ফসল আন্দাজ করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষেতের ফসল আন্দাজ করে, ঘরে রক্ষিত ফসলের বিনিময়ে বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন"।[১২]

উল্লেখ্য যে, 'মুহাকালা' ক্রয়-বিক্রয় অনেকটা ফসলের স্তুপ ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। সুতরাং জানা গেল, মুযাবানা এবং মুহাকালা অনুমান নির্ভর ক্রয়-বিক্রয়। এতে কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্রয়-বিক্রয় করা ঠিক নয়।

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. মুযাবানা ও মুহাকালা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হলো খেজুর গাছের মাথার ঝুল ও ফল খরিদ করা আর মুহাকালা হলো জমি ইজারা দেয়া"।[১৩]

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

১০. প্রাগুক্ত حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৪ والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم

১২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফিল মুযাবানা, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪০১/২০০০, পৃ. ১৪৭৫

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

১৩. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আন-নাহিউ আনিল মুহাকালা ওয়াল মুযাবানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৫-৯৪৬

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়' আল-মুযাবানা ও বায়' আল-মুহাকালা অনুমান নির্ভর ক্রয়-বিক্রয়। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ঠকার সম্ভাবনা থাকে বিধায় ইসলামে এ জাতীয় ব্যবসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(৩) বায়' আল-মুখাবারা

এমন চুক্তি করা হয় যে, একজন ফসলের ১/৩ অংশ এবং অন্যজন ২/৩ অংশ পাবে অথবা জমির নির্দিষ্ট এক অংশের সমস্ত ফসল মালিকের এবং নির্দিষ্ট অপর অংশের সমস্ত ফসল চাষী পাবে। এ ধরনের চুক্তিতে ব্যবসা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা জমির ফসল উভয় অংশে একই সমান নাও ফলতে পারে। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. মুখাবারাকে নিষিদ্ধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে বর্গা চাষের ক্ষেত্রে চাষী ও জমির মালিকের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এমন ধরনের চুক্তিতে চাষাবাদ করাতে কোনো দোষ নেই।

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়' আল-মুখাবারাতেও জমির মালিক ও চাষী উভয়ের ঠকার সম্ভাবনা থাকে। কেননা এখানে ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই একটি অসম চুক্তি করা হয়। এ কারণে এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

(৪) বায়' আল-গারার (بيع الغرار)

যেসব লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা বা প্রতারণা নিহিত থাকে সেগুলোকে বায়' আল-গারার (بيع الغرار) বা প্রতারণা মূলক লেনদেন বলা হয়। যেমন- পাথরের টুকরা মিশিয়ে কোনো জিনিস বেচাকেনা করা।[১৪]

মানুষ-মানুষকে ঠকানোর জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করে থাকে সেগুলোর অন্যতম হলো ধোঁকা বা প্রতারণা। এটি একটি গুরুতর অপরাধ। এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষের মধ্যে আস্থা এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। তাই ইসলাম ব্যবসায়ে ক্রেতাদের ধোঁকা দিয়ে মুনাফা অর্জন করা নিষেধ করেছে এবং এর সকল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে, চাই তা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক কোনক্রমেই তা জায়েয নয়। ইসলামের দাবি হচ্ছে, সব ব্যাপারেই মুসলিম সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে।[১৫]

যেসব লেনদেনে ধোঁকা বা প্রতারণা নিহিত রয়েছে রসূলুল্লাহ স. সেসব প্রতারণামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেমন, "তিনি কংকর নিক্ষেপে এবং প্রতারণা-নির্ভর

---

১৪. মাওলানা হিফজুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূদিত, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, (ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ২০৪।

১৫. আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৯

ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।[১৬] ধোঁকা বা প্রতারণা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ স. এর সুস্পষ্ট ঘোষণা "যে ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[১৭]

তিনি আরো বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দু'জনে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর হয়ে যাবে"।[১৮]

অনেক বিক্রেতা ক্রেতাকে ঠকানোর জন্য ভালো জিনিস উপরে রাখে এবং নিম্নমানের জিনিস নিচে রাখে। কেউ পরিমাণে কম দিয়ে ক্রেতাদের ধোঁকা দেয়, আবার কেউ পণ্যসামগ্রীর দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়। এভাবে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া ইসলামী বাণিজ্যনীতির পরিপন্থী।

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বর্জন করা শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই ফরয নয়; বরং প্রত্যেক কায়-কায়বারে এবং শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে ফরয। মোটকথা ধোঁকাবাজি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। নিজের তৈরিকৃত দ্রব্যের দোষ গোপন করা শিল্পীরই উচিত নয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. কে ছেঁড়া বস্ত্র সেলাই করে নেয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা করা উচিত নয়, তবে নিজ ব্যবহারের কাপড় হলে আপত্তি নেই; বিক্রয়ের জন্য করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়ার জন্য মেরামত করে সে পাপী হবে এবং তার পারিশ্রমিক হারাম হবে।[১৯]

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়' আল-গারার-এ ধোঁকা ও প্রতারণা নিহিত থাকে যা ইসলামের ন্যায়-নীতির পরিপন্থী, তাই এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

১৬. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন বাইয়িল হাসাত ওয়া আন বাইয়িল গারার, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ২৬০৮

عن ابى هريرة (رضـــ) قال: نهى رسول الله صـــ عن وعن بيع الغرر بيع الحصاة،

১৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ : আন-নাহিউ আনিল গাশ, পৃ. ২৬১০ من غشّ فليس منا

১৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আস-সিদকু ফিল বায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪২

عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

১৯. ইমাম গাযালী, আব্দুল খালেক অনূদিত, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, খ. ২, পৃ. ৭৪

(৫) বায়' আলাল-বায়' বা শিরা আলাশ-শিরা

যখন একজন ক্রেতা ও বিক্রেতা কোনো কেনা-বেচার ব্যাপারে একমত হয় এবং পরস্পরের সম্মতিতে দাম নির্ধারণ করে, তারপর অন্য ক্রেতা এসে বিক্রেতাকে বলে, 'আমি আরো বেশি দামে ক্রয় করবো' এধরনের লেনদেনকে শিরা আলাল-শিরা (شراء على الشراء) ক্রয়ের উপর ক্রয় বলা হয়। যদি দ্বিতীয় ক্রেতার উক্ত পণ্যের প্রয়োজন খুব বেশি হয় এবং প্রথম ক্রেতা তাকে দিতেও চায় তবুও এ জাতীয় লেনদেন গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় ইসলামে তা নিষিদ্ধ ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনা হলো, ইব্ন উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "তোমাদের মধ্যকার কেউ কোনো পণ্যের দরদাম করার সময় অন্যজন যেনো দরদাম না করে"।[২০]

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তাহলে তার অনুমতি ছাড়া উক্ত প্রস্তাবের উপর অন্য কারো নতুন কোনো প্রস্তাব করাও ইসলামে গ্রহণীয় নয়। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, ইবন উমর রা.-এর সূত্রে নবী স. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কারো বিয়ের প্রস্তাবের উপর বিয়ের প্রস্তাব না দেয়"।[২১]

এ জাতীয় লেনদেনের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট হয় বিধায় ইসলামে তা নিষিদ্ধ, তবে ক্রেতা এবং বিক্রেতা যদি অন্যের প্রতি আগ্রহ না দেখায় এবং দাম নির্ধারণ না করে তাহলে তৃতীয় পক্ষ দরকষাকষি করে তা ক্রয় করতে পারবে এবং তা বৈধ হবে। এ ধরনের লেনদেনকে 'নিলামে বিক্রয়' বলা হয়। এ ধরনের লেনদেনে কোনো পক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না বলে এটা বৈধ।

যখন একজন বিক্রেতা এবং ক্রেতা নির্দিষ্ট দ্রব্য লেনদেনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে, এমন সময়ে দ্বিতীয় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট এসে উক্ত পণ্যের দোষ-গুণ উল্লেখ করে বলে যে, 'আমি তোমার কাছে একই পণ্য কম দামে বিক্রি করবো'-এধরনের ব্যবসাকে বলা হয় বায়' আলাল-বায়' (بيع على البيع) বিক্রয়ের উপর বিক্রয়। এ জাতীয় লেনদেনে বিক্রেতাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং প্রথম বিক্রেতার লোকসান হয় বিধায় ইসলামে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

---

২০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ: তাহরীমু বাইয়ির রাজুল..., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৯

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

২১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুল খিতবাহ আলা আখিহি..., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৩

عن ابن عمر عن النبى قال : لايبع بعضكم على بيع بعض ولايخطب بعضكم على خطبة بعض

উল্লেখ্য যে, কোনো জিনিস যদি দু'জনের কাছে বিক্রি করা হয়, তবে তা হবে তাদের প্রথম ব্যক্তির জন্য। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, আমির অথবা সামুরা ইবন জুনদুব রা.-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দু'জনের কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করে, তবে তা হবে তাদের প্রথম ব্যক্তির"।[২২]
অন্য হাদীসে এসেছে, আল-হাসান র. সামুরা রা. সূত্রে বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "দু'ব্যক্তির কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করা হলে প্রথম ব্যক্তিই এর অধিকারী হবে"।[২৩]

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়' আলাল-বায়' বা শিরা আলাশ-শিরা জাতীয় লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং বাজারে ফটকা কারবার বেড়ে যায়। এ জন্য ইসলাম এ জাতীয় ব্যবসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

(৬) বায়' আল-মুসাররাত

বায়' আল-মুসাররাত (بيع المصراة) জাহিলী যুগের প্রচলিত ব্যবসার একটি। সে যুগে লোকেরা বিক্রয়যোগ্য পশুর স্তন দুই-তিন দিন দুধ দোহন না করে আটকে রাখতো। এজন্য যে, এতে স্তন ফুলে বড় হতো এবং ক্রেতা এই ভেবে তা ক্রয় করতো যে, পশুটি অধিক দুধ দিবে। এটা এক ধরনের প্রতারণা বিধায় রসূলুল্লাহ স. তা করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "কোনো ব্যক্তি যদি অদোহিত ফুলানো স্তন বা ওলানবিশিষ্ট বকরী খরিদ করে, তবে বাড়ী নিয়ে দোহনের পর সে ইচ্ছা করলে তা রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারে। ফেরত দিলে এক সা' খেজুর সাথে দিবে"।[২৪]

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্যে অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, আর যদি ফেরত দেয়, তবে সে সাথে এক সা' খেজুরও দিবে"।[২৫]

---

২২. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : ইয়া বাআল মুয়িযান ফাহুয়াল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৮ عَامِرِ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

২৩. প্রাগুক্ত عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

২৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : হুকমি বাইয়িল মুসাররাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪০ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

২৫. প্রাগুক্ত عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

বায়‘ আল-মুসাররাত প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ র. বলেন, যদি কেউ এমন গাভী ক্রয় করে যার স্তনে দুধ আটকে রাখা হয়েছে এবং তা থেকে সে দুধ দোহন করে তাহলে এক্ষেত্রে দু'টি উপায় রয়েছে :

(ক) ক্রেতা পশুটি নিজের কাছে রেখে দিবে অথবা

(খ) সে যে দুধ দোহন করেছে তার বিনিময়ে এক সা খেজুরসহ তিন দিনের মধ্যে ফেরত দিবে। এ বিষয়ে তিনি উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। অপরপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে, পশুটি ফেরত দেয়ার কোনো অধিকার ক্রেতার নেই। বরং সে ঐ পরিমাণ টাকা ফেরত পেতে পারে যে পরিমাণ টাকা সে অধিক দুধের আশায় দিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুধের মধ্যে পানি মিশিয়ে বিক্রি করাও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়‘ আল-মুসাররাত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, ধোঁকা ও প্রতারণা। ইসলামে ধোঁকা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ বিধায় এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ।

(৭) তালাক্কী

তালাক্কী শব্দের অর্থ হলো অগ্রগামী হওয়া, সাক্ষাৎ করা, মিলিত হওয়া ইত্যাদি। বিক্রেতা বাজারে প্রবেশের পূর্বে এবং পণ্যের দামের ব্যাপারে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পূর্বে কম দামে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করাকে তালাক্কী বা একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা বলা হয়। এরূপ লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা বাজারের প্রকৃত অবস্থা না জেনে প্রতারিত হয় এবং বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয় বিধায় এমন ব্যবসা ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ রা.-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত যে, "তিনি পণ্যদ্রব্য আসার পথে এগিয়ে গিয়ে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন"।[২৬]

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে ক্রয়ের জন্য যেতে রসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন। এ হলো ইবন নুমায়রের বর্ণনা। আর অপর দু'জন বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. সামনে এগিয়ে গিয়ে পণ্য বহনকারী কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।[২৭] আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. অন্যের মাল টানাটানি করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[২৮]

---

২৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু তালাক্কিল জালাব, পৃ. ৯৪০

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

২৭. প্রাগুক্ত عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ و قَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي

২৮. ইমাম ইবন মাজাহ্, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন তালাক্কিল জালাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৭

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

বাজারে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ব্যাহত করে কেউ যেন একচেটিয়া (Monopoly) প্রভাব বিস্তার করতে না পারে ইসলাম সে উদ্দেশ্যে 'তালাক্কী' নিষিদ্ধ করেছে। হাদীসে 'তালাক্কী আল-জালব', 'তালাক্কী আল-রুকবান', 'তালাক্কী আল-বুয়ূ' পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে । গ্রাম-গঞ্জ হতে কৃষকরা পণ্যসামগ্রী নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের থেকে পাইকারীভাবে সব সামগ্রী খরিদ করে নেয়াকে 'তালাক্কী' বলা হয়। গ্রামের কৃষকরা এতে প্রতারিত হতে পারে। কারণ, তারা এখনও শহরের পণ্য মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়নি। কাজেই ভারসাম্য দামের কমেই এরা বিক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার সকল সামগ্রী কৃষকদের থেকে দখল করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করেও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়ার অবকাশ থাকে। এতে শহরের নাগরিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাজারে প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা ব্যাহত যেন না হয় এবং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় বাজার দাম যেন নিয়ন্ত্রিত না হয় তাই মহানবী স. তালাক্কী নিষেধ করেছেন।[২৯]

আর 'আল-মুসার্‌রাত' হলো, অধিক মূল্য লাভের আশায় পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে তা বিক্রয় করা। এটা এক ধরনের প্রতারণা। ইসলাম এরূপ প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছে। তালাক্কী ও মুসার্‌রাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "বাজারে পৌঁছার পূর্বেই (স্বল্প মূল্যে) ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাত করবে না। পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেবে না।"[৩০]
ইমাম আবু হানিফা র. বলেছেন, গ্রামের কৃষকগণ যদি প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, বরং তারা যথাযথ দাম পেয়ে যায় এবং বাজারেও যদি খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাহলে কৃষকদের থেকে শহরে প্রবেশের পূর্বে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা যাবে।[৩১]

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ
তালাক্কী জাতীয় লেনদেনে বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয়ে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে উৎপাদক তথা বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শহরের ক্রেতা সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে উচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে ইসলাম এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

(৮) বায়' আন-নাজাশ
'নাজাশ' এর সংজ্ঞায় প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ তাকী উসমানী বলেন, কোনো ব্যক্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্য নয় বরং অপরকে প্রতারিত করার জন্য এবং অধিক মূল্যে ক্রয়ে

---

২৯. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, আল-মাকবাতুল ইসলামিয়া, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৯২।
৩০. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৬, পৃ. ৫২০
৩১. মানছুর ইবন ইউনুছ আল বাহুতী, *কাশফুল কিনা 'আল মাতনিল ইকনা'*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০২, খ. ৩, পৃ. ১৮৭

প্ররোচিত করার জন্য গ্রাহক সেজে দ্রব্যের চড়া মূল্য দেয়ার প্রস্তাব করাকে 'নাজাশ' বলে। নাজাশ অর্থ দালালী করা অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জনগণকে প্ররোচিত করে দাম বাড়ানো। এরূপ কল্পনাপ্রসূত নিলামের মাধ্যমে পণ্য দ্রব্যের দাম বাড়ানো ইসলামে জঘন্য অপরাধ বিধায় এ ধরনের ব্যবসা নিষিদ্ধ।

এভাবে মূল্য বাড়ানোর জন্য মিথ্যামিথ্যিভাবে পণ্যদ্রব্যের দামদস্তুর করতে রসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা নাজাশ অর্থাৎ ক্রেতাকে প্রতারিত করে মূল্য বাড়ানোর জন্য দাম সাব্যস্ত করবে না।[৩২] উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় এ ধরনের কর্মতৎপরতাকে দালালি বলা হয়। রসূলুল্লাহ স. বেচা-কেনায় (ধোঁকার উদ্দেশ্যে) দালালি করতে নিষেধ করেছেন।[৩৩]

ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর মিলে কোনো বস্তুর দাম সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এমতাবস্থায় অন্য ব্যক্তি এসে এর উপর দিয়ে দর করা মাকরূহ। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, আর তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে"।[৩৪]

বহিরাগত ব্যাপারী লোকদের শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে মালামাল ক্রয় করা মাকরূহ, যদি এতে সর্বসাধারণের ক্ষতি হয় বা আমদানিকারকদের নিকট পণ্যদ্রব্যের স্থানীয় বাজার মূল্য অস্পষ্ট রাখা হয়। মানুষের ক্ষতি ও ধোঁকার কারণে এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। হাদীসে এ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে, নবী স. বহিরাগত আমদানিকারকের সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি পণ্য মালিকের সাথে আগাম সাক্ষাৎ করে এভাবে কোনো পণ্য খরিদ করে তবে পণ্যের মালিক বাজারে আসার পর তার পূর্ব বিক্রি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে।[৩৫]

---

৩২. ইমাম ইবন মাজাহ্, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিননাহি আনিন নাজাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৭ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. অনুচ্ছেদ : লা ইয়াবিউর রাজুলু আলা আখিহি ....., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৭
عن ابى هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايبيع الرجل على بيع أخيه ولايسوم على سوم اخيه

৩৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফিত-তালাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮০
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة

যদি এতে মানুষের ক্ষতি না হয় এবং ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ না করা হয়, তবে এভাবে ব্যবসা করতে কোনো দোষ নেই।[৩৬] দুর্ভিক্ষের সময় শহরবাসী লোকেরা যদি লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রামবাসী লোকদের পক্ষ হয়ে দালালী করে মালামাল বিক্রি করে এবং এতে শহরবাসী লোকদের কষ্ট বা ক্ষতি হয়, তবে এ ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ হবে। যদি দুর্ভিক্ষের অবস্থা না হয় এবং মানুষের কষ্ট না হয় তবে মাকরূহ হবে না। গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বেচা-কেনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. ঘোষণা করেন, "স্থানীয় লোকজন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করবে না। তোমারা লোকদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তাদের একজন থেকে অপরজনকে রিয্ক দান করবেন"।[৩৭] ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. স্থানীয় লোকদের বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবন আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, বহিরাগতদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের বেচাকেনার অর্থ কী? তিনি বললেন, স্থানীয় লোকজন যেন দালাল না সাজে।[৩৮]

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

বায়' আল-নাজাশ দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোনো একজন বা উভয়ই প্রতারিত হয়। তৃতীয় পক্ষের কোনো ব্যক্তি তথা দালাল কোনো বিনিয়োগ না করে এবং ঝুঁকি গ্রহণ না করে লাভবান হয় বিধায় ইসলাম এ জাতীয় ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ করেছে।

(৯) দালালি

'দালালি' বলতে কমিশনের বিনিময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সাহায্য করা বোঝায়,[৩৯] যদিও এর পাশাপাশি দালালি শব্দের আরো কিছু অর্থ বিদ্যমান আছে। যেমন- অসঙ্গতভাবে পক্ষ সমর্থন করা ও অন্যায়ভাবে কাউকে সাহায্য করা। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রথম অর্থটিই গৃহীত।[৪০]

আরবি ভাষায় দালালিকে 'সিমসারাহ' (سِمْسَرَة) বলে। আর যে দালালি করে তাকে 'সিমসার' (سِمْسَار) বলে। যার অর্থ হলো অভিজ্ঞ, চালাক, বিচক্ষণ। দালালির পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাম্মদ রাওয়াস কালজী বলেন,

---

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৭৩

৩৭. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আল-ইউবিআ হাযির লি-বাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৭

عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

৩৮. *প্রাগুক্ত*

৩৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১

৪০. প্রাগুক্ত

سمسار: وسيط وبائع وشاري وساعي للواحد منهما، فارسي من سپسار.
'সিমসার' শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত যার অর্থ- ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী।[৪১]

সুতরাং দালালি বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের অথবা একজনের সন্তুষ্টির জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা বোঝায়।[৪২]

দালালির যেমন ইতিবাচক দিক আছে, ঠিক তেমনি দালালির ক্ষেত্রে অসততার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাবও পড়তে পারে। যদি দালালি বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিংবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তবে ইসলাম তাতে অনুমোদন দেয় না। যেমন- ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া র. একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কোনো দালাল থাকবে না। এটা রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে নিষেধ। কেননা তাতে ক্রেতাগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর যখন মুকিম বা স্থায়ী ব্যক্তি কোনো আগন্তুক ব্যক্তির পণ্য বিক্রয় করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করে যা কেনার জন্য মানুষ সেদিকে শরণাপন্ন হয়, তখন ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা আগন্তুক ব্যক্তি তো বাজার দর সম্পর্কে জানে না।[৪৩]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে অস্তিত্ব নেই এমন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় যেমন নাজায়েয, ঠিক তেমনি দালাল নিয়োগের মাধ্যমে কৌশলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করাও নাজায়েয। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যারা 'দালালি' বা মধ্যস্থতা করে তারা অনেক সময় মিথ্যা তথ্য দিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাকে প্রতারিত করে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। ঠকিয়ে বা প্রতারণা করে দালালি গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে মহানবী স. বেচা-কেনায় (ধোঁকার উদ্দেশ্যে) দালালি করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪]

---

৪১. মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী, *মু'জামু লুগাত আল-ফুকুহা*, সৌদি আরব : ইহইয়াউত তুরাছিল ইসলামী, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৯

৪২. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়া*, তা. বি., পৃ. ২৬২

৪৩. ইমাম ইবন তাইমিয়া, *মাজমূ' ফাতাওয়া*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়া, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ৩২৫

لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ وَهَذَا نَهْيٌ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِينَ فَإِنَّ الْمُقِيمَ إذَا تَوَكَّلَ لِلْقَادِمِ فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهَا وَالْقَادِمُ لَا يَعْرِفُ السِّعْرَ ضَرَّ ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ } "

৪৪. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আত-তালাক্কী, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ২৩৮০

عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

দালালির মাধ্যমে দালাল ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার আশায় কাজ করে। লাভের আশায় দালাল প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। তা ছাড়া এতে ক্রেতা-বিক্রেতা যে কোনো একজনের বড় রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে ইসলামে দালালি নিষিদ্ধ।

(১০) মজুদদারি

ইসলামী পরিভাষায় মজুদদারিকে 'ইহ্তিকার' বলা হয়। মজুদদারী অর্থ খাদ্য-শস্য মজুদ করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা এবং এর দ্বারা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রচুর পরিমাণ লাভবান হওয়া।[৪৫] ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে, 'كلما اخر بالعامة حبسه فهو احتكار' অর্থাৎ যেসব জিনিস আটকিয়ে বা মজুদ রাখলে সর্বসাধারণের কষ্ট ও ক্ষতি হয়, তাকে 'ইহ্তিকার' বা 'মজুদদারী' বলে।[৪৬]

ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা (Natural Compitition) এর পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও লোকেরা স্বার্থপরভাবে ও লোভের বশবর্তী হয়ে অপরের ওপর টেক্কা দিয়ে নিজের ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করতে থাকবে, তা কিছুতেই কাম্য নয়। খাদ্যপণ্য এবং জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ সব ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোর নির্দেশনা।[৪৭]

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবকে কষ্ট দিয়ে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তথা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে সম্পদ মজুদ করে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। মহানবী স. এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্য দ্রব্য মজুদ করবে সে মহান আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং তার সাথে মহান আল্লাহ্‌র কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"[৪৮] রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, 'অপরাধী বা পাপী ব্যক্তি ছাড়া কেউ পণ্য মজুদ করে রাখার কাজ করে না'।[৪৯]

---

৪৫. ইমাম গাযালী, মোহাম্মদ খালেদ অনূদিত, *ইসলামে হালাল উপার্জন ও ব্যবসা*, ঢাকা : ইসলাম পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ৩৩

৪৬. মুহাম্মদ আমীন, *হাশিয়াতু ইব্‌ন আবিদীন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩৮৬, খ. ৬, পৃ. ৩৯৮।

৪৭. আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪

৪৮. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৪৮৮০

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

৪৯. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আল-হিকারাহ ওয়াল জালাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৬, হাদীস নং-২১৫৪

عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يحتكر إلا خاطىء)

এখানে 'অপরাধী' শব্দটিকে হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কেননা কুরআন মাজীদে ফিরাউন, হামান প্রমুখ বড় বড় কাফির ও আল্লাহদ্রোহীদের সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা হয়েছে, إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ "নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিলো।"[৫০]

মজুদদারের পার্থিব জীবনের শাস্তির কথা উল্লেখ করে মহানবী স. ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন যাবৎ মজুদ করে রাখবে, মহান আল্লাহ্ তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দারিদ্র্য দিয়ে শাস্তি দিবেন।"[৫১]

মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য ফিক্হ্ শাস্ত্রে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

১. শহরের অভ্যন্তর হতে ক্রয় করে মজুদ করতে হবে। যদি অন্য কোনো অঞ্চল হতে আমদানী করে মজুদ করে বা নিজের জমিতে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় না করে মজুদ করে তবে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

২. খাদ্য সামগ্রী মজুদ করলে তা নিষিদ্ধ, তবে মধু, গবাদি পশুর খাদ্য মজুদ করলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

৩. মজুদ করার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে জনসাধারণের সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি মজুদ করার কোনো প্রতিক্রিয়া বাজারে প্রতিবিম্বিত না হয়, তবে তা নিষিদ্ধ হবে না।[৫২] আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী বলেন, পণ্য মজুদকরণ দুটি শর্তে হারাম :

   (ক) এমন এক স্থানে ও এমন সময় পণ্য মজুদ করা যখন তার কারণে জনগণকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

   (খ) মজুদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে অধিক মূল্য আহরণ। যার ফলে মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।[৫৩]

আল্লামা শামী র. বলেন, দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যদি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বিচারক বা আদালত মজুদদারকে খাদ্যশস্য বিক্রি করে দেয়ার

---

৫০. আল-কুরআন, ২৮ : ৮

৫১. ইমাম ইব্ন মাজাহ্, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আল-হিকারাহ ওয়াল-জালাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০৬ من احتكر على المسلمين اربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس

৫২. ইব্ন কুদামা, *আল-মুগনী,* বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৫, খ. ৪, পৃ. ১৫৪

৫৩. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

জন্য আদেশ জারি করবেন। মজুদদার যদি হুকুম তামিল না করে, তবে বিচারক তার খোরাকী বাবদ খাদ্যশস্য রেখে বাকীগুলো বিক্রি করে দিবেন। যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার মত টাকা-পয়সা না থাকে, তবে বিচারক ক্রমশ তা বণ্টন করে দিবেন। পরে তাদের হাতে খাদ্যশস্য আসলে আদালত তাদের নিকট থেকে তা উসূল করে দাতার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিজস্ব জমির খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অবশ্য কেউ যদি নিজের জমির ফসল হতে নিজের ও পরিবারের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।[৫৪]

ইসলামে মজুদদারী হারাম হওয়ার কারণ এই যে, এতে আল্লাহ্র বান্দাগণের কষ্ট ও অনিষ্ট হয়ে থাকে। কৃষক নিজের ক্ষেতের শস্য যখন ইচ্ছা বিক্রয় করতে পারে; শীঘ্র বিক্রয় করা তার উপর ওয়াজিব নয়, তবে বিলম্ব না কারই উত্তম। কিন্তু কৃষক যদি অন্তরে এরূপ আশা পোষণ করে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হোক, তবে তার এরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই নিন্দনীয়। খাদ্যশস্য দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠলেই তা মজুদ করে রাখা হারাম।[৫৫]

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

মজুদদারির মাধ্যমে বাজারে খাদ্য ও পণ্যসামগ্রীর কৃত্রিম সংকট দেখা দেয়। এতে স্বল্প আয়ের লোকজন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া কখনো কখনো মজুদদারির কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে। মজুদদারি করে মুষ্টিমেয় মানুষ অত্যধিক লাভবান হয়। এহেন কারণে ইসলামে মজুদদারি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(১১) হারাম বস্তুর ব্যবসা

অপবিত্র ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ও তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম। এ কারণে তা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করা হারাম। যেমন ক্রেতা তথা ভোক্তার কাছে মৃত জীব বা নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকারক পণ্য বা খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করা। মহান আল্লাহ বলেন- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত এবং শূকর।"[৫৬] নবী স. বলেন- "আল্লাহ এবং তাঁর রসূল স. মদ, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৫৭] এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যা

---

৫৪. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

৫৫. ইমাম গাযালী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৬৯

৫৬. আল-কুরআন, ৫ : ৩

৫৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বাইয়িল মাইতাতি ওয়াল আসনাম, বৈরুত : দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং ২১২১

মূলগত হারাম তার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোনো জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন।"[৫৮]

উল্লেখ্য যে, ইসলামে হালাল জিনিসের ব্যবসা বৈধ এবং হারাম জিনিসের ব্যবসা অবৈধ। ইসলামের বাণিজ্যনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হলো, হারাম বস্তুসামগ্রীর ব্যবসা করা যাবে না।

এরূপ পণ্য সামগ্রীর কারবার করা যা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ অথবা এমন বস্তু বেচাকেনা করা যা মূলগত অপবিত্র যেমনঃ শরাব, মৃতদেহ, প্রতিমা, শুকর প্রভৃতি এরূপ সামগ্রীর কারবার ইসলামে নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

ইসলাম সর্বদা পূত-পবিত্রতাকে গ্রহণ করেছে আর অপবিত্রতাকে বর্জন করেছে। অপবিত্র পণ্য সামগ্রির ব্যবসায় মানব মনকে অপবিত্র ও কলুষিত করে বিধায় এ জাতীয় ব্যবসায় ইসলামে নিষিদ্ধ।

উপসংহার

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানব জীবনের উপর্যুক্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মত জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতিমালা। তাই সকল প্রকার ব্যবসাকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। মানবচরিত্র বিধ্বংসী, মানব সমাজে অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সকল অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসায় ইসলামে নিষিদ্ধ। উক্ত নিষিদ্ধ ব্যবসায়গুলো থেকে মানুষ বিরত থাকলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

৫৮. ইমাম দারাকুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি./ ১৯৬৬ খ্রি. হাদীস নং ২০

عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর ও সংযোজন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রযুক্তি, মহাশূণ্য ও চিকিৎসাসহ সকল পর্যায়ে বিজ্ঞান মানুষকে একের পর এক চমক উপহার দিয়ে চলেছে। বিশেষত চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের অতীত অনেক সেকেলে ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞান মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চিকিৎসার উপকরণ বানাতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে এখন মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক দেহ থেকে অপর দেহে সংযোজন করার মাধ্যমে মানুষকে নতুন করে জীবনের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণ, অন্যদিকে অপর একটি জীবনের নতুন জীবনদান, এ দু'য়ের মধ্যে ইসলামপ্রিয় মুসলিম জনগণ যেন কোনো কুল কিনারা করতে পারছে না। মুসলিম মাত্রই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ সংকট উত্তরণেও ইসলামের রয়েছে যুক্তিযুক্ত সমাধান। তারই সন্ধানে আমাদের এ প্রয়াস। বর্তমান প্রবন্ধে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী আইনের যুক্তিযুক্ত সমাধান সম্বলিত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।*]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. "যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো"।[1] এভাবে মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি করার মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিলেন।[2] রক্ত-গোশতে গড়া মানুষকে আল্লাহ সকল সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেন। এ সৃষ্টিকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"।[3] অন্যত্র এ সম্মানের পুনরাবৃত্তি করে বলেন,

---

* পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামী আইন ও ইসলামী ব্যাংকিং এন্ড তাকাফুল, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়শিয়া (IIUM)

১. আল-কুরআন, ২ : ৩৪

২. আব্দুস সালাম আব্দুর রাহীম আস-সুকারী, *নাকল ও যারাআত আল-আ'দা আল-আদমিয়্যাহ মিন মানযুর ইসলামী*, আল-কাহেরা : দারুল মানার, ১৯৮৮, পৃ. ২১

৩. আল-কুরআন, ২ : ২৯

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا منه

"আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু"।[৪] মানুষকে এ সম্মান শুধু তার জীবিত অবস্থায় দেয়া হয়নি, বরং মৃত্যুর পরেও মানুষকে সম্মানিত করা হয়েছে। তাই তাকে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে সসম্মানে কবরস্থ করার জন্য আল্লাহ একটি কাকের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[৫]

মর্যাদার আসনে মানব জাতি

- কুরআন-হাদীস বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, রক্ত গোশতে গড়া মানব দেহকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে। কাজেই ইসলামে মানুষ সম্মানিত এবং মর্যাদাবান।[৬] এ সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ নিম্নরূপ: [৭]
- এ জগতের সব কিছু মহান আল্লাহ মানুষের সেবার নিমিত্তে তার আয়ত্তাধীন করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি স্থলে ও সমুদ্রে, তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিযক দিয়েছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।[৮] তাফসীরকারকগণ বলেন, এ আয়াতে সামগ্রিকভাবে মানবকূলের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।[৯]
- এমনিভাবে এ সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সুনিপুণভাবে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[১০] মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান

---

[৪] আল-কুরআন, ৪৫ : ১৩

[৫] আল-কুরআন, ৫ : ৩১

[৬] ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, *আল-মাওকিফ আল-ফিক্হী ওয়াল আখলাকী মিন কাদিয়্যাত যার' আল-আ'দা,* দিমাস্ক: দারুল কালাম, ১৯৯৪, পৃ. ১৮২

[৭] আব্দুস সালাম আব্দুর রাহীম আস-সুকারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-৬৭

[৮] আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

[৯] ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম,* তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৫১; ইমাম কুরতুবী, *আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন,* তা. বি., খ. ৫, পৃ. ৩৯০৯; আল-আলূসী, *রুহুল মা'আনী,* তা. বি., খ. ১৫, পৃ. ১১৭

[১০] আব্দুস সালাম আব্দুর রাহীম আস-সুকারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

প্রতিপালকের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস করেছেন; যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।"[১১] অন্যত্র মহান আল্লাহ তীন, যায়তুন, সিনাই পর্বত এবং মক্কা শরীফের শপথ করে বলেছেন: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দর গঠন ও আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।"[১২]

- সম্মান ও মর্যাদার আরো বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মানুষের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ, মারামারি, হত্যা এবং আঘাত করা অপর মানুষের জন্য হারাম করেছেন। যারা এ সীমারেখা লঙ্ঘন করতে চায় তাদের জন্য দণ্ডবিধির বিধান রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ "তাদের জন্য তাতে আমি বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ জখম"।[১৩]
- মানুষকে প্রদত্ত এ সম্মান ও মর্যাদা শুধু তার জীবিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার মৃত্যুর পরেও তার মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, মুসলমান হলে তার জন্য দু'আ করা এবং দাফন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তার মৃতদেহ অপমান ও লাঞ্চনার শিকার না হয়।
- ইসলাম মানুষের দেহকে আল্লাহর মালিকানাধীন বলে ঘোষণা দেয়। তাই নিজের দেহের জন্য ক্ষতিকর সকল প্রকার কার্যকলাপ মানুষের উপর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে অন্যায় ভাবে তা করবে আমি তাকে অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর এটা আল্লাহর জন্য সহজ"।[১৪]

---

১১. আল-কুরআন, ৮২ : ৬-৮

১২. আল-কুরআন, ৯৫ : ৪

১৩. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫

১৪. আল-কুরআন, ৪ : ২৯-৩০

- কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ব্যতীত নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিও না। তোমরা সৎকাজ করো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন"।[১৫] রসূলুল্লাহ স.ও বিভিন্ন ভাষায় মানুষকে নিজের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ, ধ্বংস এবং হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে পাহাড় থেকে পড়ে, বিষ পান করে কিংবা লোহাখণ্ড দিয়ে আত্মহত্যা করবে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে"।[১৬]
- মানুষের সম্মান ও মান-মর্যাদার আরো অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, মানুষ যাতে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার না হয়, এ জন্য ইসলামে স্বাধীন মানুষের ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ বলেছেন: "কিয়ামত দিবসে আমি তিন শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে বাদী হবো : (১) ঐ ব্যক্তি যে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে; (২) ঐ ব্যক্তি সে স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি যে শ্রমিক খাটানোর পর তার পারিশ্রমিক দেয় না"।[১৭]

---

[১৫] আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

[১৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ : শুরবুস-সুম্ম ওয়া- দাওয়া বিহি, হাদীস নং ৫৭৭৮; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : গালযু তাহরীমি কাতলিল ইনসান নাফছিহি, হাদীস নং ১০৯

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهْوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ ، يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا »

[১৭] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান বা'আ হুররান, হাদীস নং ২২২৭

حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ »

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম মানুষকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। ইসলাম যাবতীয় ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে মানুষকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে এবং অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়া ও হত্যা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের ক্ষতি হয়, মানুষকে অকেজো করে দেয় এমন কোনো কাজ মানবদেহের বিরুদ্ধে করা যাবে না।[১৮]

আলোচনার সুবিধার্থে মূল বিষয়টিকে তিনটি অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন:

(ক) মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়,

(খ) জীবিত অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান,

(গ) মৃতের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান।

(ক) মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়

অধিকাংশ মুসলিম আইনবিশারদ অভিমত দিয়েছেন, মানবদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা বৈধ হবে না, চাই তা বাহ্যিক হোক কি অভ্যন্তরীণ, কি সিঙ্গেল হোক যেমন- হার্ট, প্লীহা, কলিজা ইত্যাদি অথবা ডাবল হোক যেমন- কিডনী, অণ্ডকোষ, ফুসফুস ইত্যাদি। স্বাধীন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা হারাম হওয়ার বিষয়ে মুসলিম ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১৯] বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশস্থ সকল ফিক্‌হ ও গবেষণা একাডেমী এক ও অভিন্ন ভাষায় সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, কোনো অবস্থাতেই মানবদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।[২০]

---

১৮. ড. আবদুর রহমান দুয়াইনী, *কাদায়া মুয়াসারাহ,* জামে'আ আল-আজহার, কুল্লিয়্যাহ আশ-শারী'আহ ওয়াল কানুন, ২০০৬, খ.১, পৃ.৪৬৫।

১৯. ইমাম আল-কাসানী, *বাদাই উস-সানাই,* আল-কাহেরা : মাতবা'আ শারিকাত আল-মাতবু'আত আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩২৭, খ. ৫, পৃ. ১৪৫; ইমাম যাইলা'ঈ, *তাবয়ীন আল-হাকায়িক শরহে কানয্‌ আদ-দাকাইক,* আল-কাহেরা : মাতবাআ আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি. খ. ৪, পৃ. ৪৪; *রাদ্দুল মুহতার আলা আদ্‌-দুর আল-মুখতার,* তা.বি., খ. ৭, পৃ.১৫; ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ,* আল-কাহেরা : মাতবা'আ মুস্তফা আল-হালাবী, ১৩৩৯, খ. ২, পৃ. ১৭৭; ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা,* তাহকীক : শাইখ আহমদ মুহাম্মদ শাকির, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি. খ. ৯, পৃ. ১৭।

২০. *ফাতওয়া মাজমা' আল-ফিক্‌হিল ইসলামী,* আদ্‌-দাওরাহ আর-রাবি'আহ, ১৯৮৮। উক্ত ফাতওয়ার ভাষ্য হচ্ছে:

"وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لايتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال.

ফাতওয়া শাইখ যাদুল হক আলী যাদুল হক, শাইখুল আজহার ও মুফতী আদ্‌-দিয়ার আল-মিসরিয়্যাহ, নং ১৩২৩, ১৯৭৯। উক্ত ফাতওয়ার ভাষ্য হচ্ছে:

"ويحرم اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه، كما يحرم اقتضاء مقابل للدم لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعا لكرامته".

দলীল

এক : মানবদেহ এবং এর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কোনো বস্তু নয়। এটা এমন কোনো পণ্য-দ্রব্য নয় যেখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও লেনদেন করার সুযোগ আছে। মানবদেহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন, বেচা-কেনার ঊর্ধ্বে রেখেছেন এবং এখানে কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করা অকাট্যভাবে হারাম করেছেন।[২১]

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً "অবশ্যই আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং জলে স্থলে তাকে সওয়ারী দান করেছি, তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস থেকে রিযক দিয়েছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি"।[২২] সুতরাং যিনি সম্মানিত, সকল সৃষ্টির উপর যাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, সৃষ্টির সব কিছুই যার সেবায় সৃষ্টি করা হয়েছে, স্বয়ং তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুতে পরিণত করা তাকে প্রদত্ত মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক।[২৩] উপরে প্রদত্ত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম আইনবিদগণের সর্বসম্মত মতামত হচ্ছে, মানবদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো অবস্থাতেই ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

দুই : মানবদেহ মূলত মানুষের মালিকানাধীন নয়, বরং প্রকৃত অর্থে মহান আল্লাহ এর মালিক। মানুষকে তা আমানত স্বরূপ দেয়া হয়েছে এবং মানুষের নিকট দাবি হচ্ছে, মানুষ যেন আমানতের সাথে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক কাজে এর ব্যবহার করে এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে একে যেন হেফাযত করে। মানুষ

---

২১. আবদুস সালাম আবদুর রাহীম আস-সুকারী, *নাকল ও যারা'আত আল-আ'দা আল-আদমিয়্যাহ মিন মানযুর ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭৩।

" و لاشك أن في بيع الحر – ولو جثث– ضياعا لاستخلاف الله له في الأرض وقلبا لنظام الكون، فحقيقة البيع منعدمة فيه، وليس بمال عند أحد ممن له دين سماوي ... المبسوط لشمس الدين السرخسي، جــ١٣، صـــ ٣، جــ١٥، صـــ١٢٥".

وقال في الفتاوى الهندية: "إن الحر لايضمن بالغصب صغيرا كان أو كبيرا، لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك، والحر لايصلح فيه التمليك و يضمن بالجناية، لأن الجناية إتلاف" جــ٥، صـــ ١٤٨-١٤٩.

২২. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

২৩. হাসান আলী আল-শাযলী, ইনতিফা' আল-ইনসান বি আ'দাই জিসমি ইনসান আখার হাইয়্যান আও মাইতান ফিল ফিক্‌হ আল-ইসলামী, *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হী আল-ইসলামী*, ১৯৮৮, ইস্যু ৪, খ. ১, পৃ.২৮৬

যদি একে ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে তাহলে সে আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের বড় খেয়ানতকারী হবে।[২৪]

তিন : মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলত আল্লাহর মালিকানায় তার অনুমতি ব্যতিরেকে লেনদেন করা হয়। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ইসলামী আইনে অনুমোদিত নয়।[২৫] রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "মালিকানায় নেই এমন কোনো বস্তু বিক্রি করতে যেও না"।[২৬]

চার : মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার মাধ্যমে সমাজে অনেক বড় ক্ষতি ও ধ্বংসের দ্বার উম্মোচন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কখনো দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত জনগণ প্রয়োজনের তাগিদে অন্যান্য জিনিসের মত তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি শুরু করে দেবে। আবার হয়ত বা কখনো বিশাল অংকের টাকার লোভে নির্দোষ মানুষ বিশেষ করে শিশু অপহরণের জোয়ার শুরু হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে সমাজে নেশাজাত দ্রব্যের ব্যবসা থেকেও মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ব্যবসা শুরু হয়ে যাবে। বিশাল অংকের টাকার লোভে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটাকাটির এক প্রবল জোয়ার শুরু হয়ে যাবে।[২৭]

উল্লেখ্য যে, স্বেচ্ছায় বিনামূল্যে মানবদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাউকে দান করার মাধ্যমে উপকার করার পর যদি নিঃশর্তভাবে এবং পূর্ব নির্ধারিত ছাড়া উপকৃত ব্যক্তি উপহার, উপঢৌকন বা সহযোগিতা স্বরূপ কিছু দিয়ে থাকে তাহলে তা বৈধ হবে। বরং তা প্রশংসিত এবং উন্নত চরিত্রের পরিচয় বহনকারী একটি কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[২৮] এটা ঋণদাতা ব্যক্তিকে তার প্রদত্ত ঋণ ফেরত দেয়ার সময় পূর্ব নির্ধারিত ছাড়া কিছু অতিরিক্ত দেয়ার অনুরূপই হবে, যা প্রশংসিত ও শরীয়াত অনুমোদিত একটি কাজ। স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. এটাই করেছেন, ঋণদাতাকে তার

---

২৪. ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাভী, *হুকমু বাই'ল ইনসান লি আফওইন মিন আ'দাইহি আও আত্-তাবাররু' বিহি*

২৫. হাসান আলী আল-শাযলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

২৬. ইমাম আবু-দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-ইজারা, অনুচ্ছেদ : ফির রাজুলি ইয়াবি'উ মা লাইছা এনদাহু, মিশর : মাতাবা'আ মুস্তফা মুহাম্মদ, তা. বি. খ. ২, পৃ. ১০৫

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

২৭. হাসান আলী আল-শাযলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫; মুহাম্মদ আলী আল-বার, *আল-মাওকাফ আল-ফিক্হী ওয়াল আখলাকী মিন কাদিয়্যাত যার' আল-আ'দা,* দামেস্ক : দারুল কালাম, ১৯৯৪, পৃ. ১৮৪।

২৮. ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *কাদায়া মুয়াসারাহ,* দিমাস্ক : দারুল কালাম, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৫৩৪; শাইখ আতিয়া সাকার, *আল-ফাতাওয়া,* মিসর : মাকাতাবাহ আল-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২৮৯

ঋণসহ কিছু অতিরিক্ত প্রদান করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে তার ঋণ পরিশোধ করে"।[২৯]

কতক মুসলিম কিছু সংখ্যক ফকীহ-এর অভিমত হচ্ছে, প্রয়োজনের নিরিখে অপর মানুষেকে বাচাঁনোর তাগিদে মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:[৩০]

(১) ক্রয়-বিক্রয় মানুষের মর্যাদার জন্য হানিকর হয় এমন পর্যায়ে হতে পারবে না। অর্থাৎ এর মাধ্যমে শুধু বিশাল অংকের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মুনাফা অর্জন লক্ষ্য হতে পারবে না।

(২) মহান আল্লাহ যে অঙ্গ যে জন্য সৃষ্টি করেছেন তার বিক্রয় সে কাজের নিমিত্তেই হতে হবে। যার জন্য ক্রয় করা হয় তার অগোচরে হতে পারবে না।

(৩) অঙ্গহানির মাধ্যমে যে ক্ষতি হয়, বিক্রেতা তার বিক্রিত অঙ্গ হারানোর মাধ্যমে এর থেকে বেশি ক্ষতির প্রতিরোধের জন্য বিক্রি করতে হবে।

(৪) মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তদসংশ্লিষ্ট ইসলামী আইনের মৌলিক কোনো বিধি-বিধানের লঙ্ঘন হতে পারবে না। যেমন, অপরের চুল জোড়া লাগানো, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

(৫) পরিস্থিতি এমন হতে হবে যে, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যেমন, কোনো কৃত্রিম অঙ্গ লাগানো বা এ জাতীয় কোনো পদ্ধতি যার মাধ্যমে অপরের অঙ্গ লাগানো থেকে বিরত থাকা যেতে পারে।

(৬) ক্রয়-বিক্রয় নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হতে হবে, যে উপরোক্ত শর্তাবলি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার যুক্তি ও পর্যালোচনা

ফকীহগণের একটি দলের মতে, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা বৈধ। নিম্নে এই বৈধতা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত যুক্তি ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো :

---

২৯. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : হুসনুল কাদা, হাদীস নং ২৩৯৩।
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ – صلى الله عليه وسلم – « أَعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ « أَعْطُوهُ » . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِى ، وَفَّى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً »

৩০. ড. মুহাম্মদ নাঈম ইয়াসিন, বাই' আ'দায়ি আল-ইনসান, *মাজাল্লাত আশ-শারীআহ*, জামেআ' আল-কুয়েত, মার্চ ১৯৮৭

এক : রোগীকে তার চিকিৎসা, ঔষধপত্র ও ডাক্তারের ফি বাবদ টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়। তাই যে ব্যক্তিকে চিকিৎসার নিমিত্তেই অঙ্গ প্রদান করা হচ্ছে, যেটা তার একমাত্র ঔষধ, সে কেন অঙ্গ প্রদানকারীকে এর বিনিময়ে টাকা-পয়সা প্রদান করবে না?[৩১]

- **পর্যালোচনা** : এ যুক্তির জবাবে বলা যায়, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে চিকিৎসা করা কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়, বরং এটা ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা, যা শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই বৈধ করা হয়েছে। যেমন প্রয়োজনের মুহূর্তের জন্য রক্ত, মৃতদেহ ও শুকরের মতো নিষিদ্ধ বস্তুও বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে এগুলোর বিনিময় গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। কারণ এগুলো কুরআন, হাদীস ও মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে মানবদেহের বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়, কারণ এটা সর্বসম্মতিক্রমে সম্মানিত ও পবিত্র। শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই তা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৩২]

দুই: ইসলামী আইনে মানুষ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূল্যমানযোগ্য বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তিকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে বা অঙ্গহানি করলে হত্যাকারী নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্তপণ বা এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।[৩৩]

- **পর্যালোচনা** : রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় অপরাধ এবং বাড়াবাড়ির কারণে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে তার কোনো অঙ্গ অপরকে দান করে তাহলে এ ক্ষেত্রে রক্তপণ বা এর ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এর বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তাই রক্তপণের সাথে এ অবস্থার তুলনা করা সঠিক নয়।[৩৪]

---

৩১. ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, *ইসলাম আওর জাদীদ মেডিকেল মাসায়েল*, দেওবন্দ, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৮৩; ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৩৪. ইসমাত উল্যাহ এনায়েত উল্যাহ মুহাম্মদ, *আল-ইনতিফা' বি আযদাঈ আল-আদমী ফিল ফিক্হ আল-ইসলামী*, মাস্টার্স থিসিস, জামে'আ উম্মুল কুরা, ১৪০৮, পৃ. ৬৯; ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫, ১৮৮

واتفق الفقهاء على أن الإنسان ليس بمال. وليست الدية قيمة النفس بل هي عقوبة الاعتداء على حياة المجني عليه. قال الكاساني في البدائع: ضمان القتل ضمان الدم لا ضمان المال، وقال العز الدين بن عبد السلام: وأما كفارة قتل الخطأ فوجبت جبرا لما فوت من حق الله تعالى، كما وجبت الدية جبرا لما فات من حق العبد.

তিন: মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার পক্ষে যারা মত প্রদান করেন তাদের অপর একটি যুক্তি হচ্ছে, প্রয়োজনের সময় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় করা মানুষের সম্মান ও মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি নিম্নরূপ:

(১) মুসলিম ফকীহগণ যদিও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের আইনবিদগণ ব্যতীত অন্য কেউ একে মানুষের মান-মর্যাদার পরিপন্থী বলে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি। বরং তারা এ জন্যই হারাম করেছেন যে, কর্তিত অঙ্গের মাধ্যমে যেহেতু কোনো উপকার সাধন সম্ভব নয় তাই মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটাকাটি করে একে নষ্ট করে ফেলা জায়েয নয়। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপর মানুষের শরীরে জোড়া লাগিয়ে তাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাচাঁনো যায়। এ উপকারের প্রতি লক্ষ্য করেই বর্তমান সময়ের ফকীহগণ মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনামূল্যে দান করাকে বৈধ বলেছেন। তাঁরা আরো বলেন, যেহেতু দান করা বৈধ তাই ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হবে।[৩৫]

(২) মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় তার মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক তখনই হবে, যখন শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যেই করা হয়। কিন্তু একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত আসল রূপ বজায় রেখে যথাস্থানে সংযোজনের নিয়তে যদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে তা মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। তাই এ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হবে না।[৩৬]

পর্যালোচনা : উপরোক্ত যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত মতামত বেরিয়ে আসে

প্রথমত: উপরোক্ত যুক্তি প্রদর্শনে বলা হয়েছে যে, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক-এ কারণ শুধু হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ মানুষের কর্তিত অঙ্গ কোনো উপকারে আসে না, এ কারণ প্রদর্শন করেছেন। এমনকি ইবন কুদামা র. এর একটি উক্তি পাওয়া যায় : "স্বাধীন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় হারাম করা হয়েছে, কারণ মানুষ কারো মালিকানাধীন কোনো সম্পদ নয় এবং মানুষের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় হারাম করা হয়েছে, কারণ মানুষের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না"।[৩৭]

---

৩৫. ড. মুহাম্মদ নাঈম ইয়াসিন, প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৫, খ.৪, পৃ.২৮৮।

وَإِنَّمَا حَرُمَ بَيْعُ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، وَحَرُمَ بَيْعُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ .

কিন্তু মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক, এ কারণ শুধু হানাফীগণ কর্তৃক বর্ণিত নয়, বরং তা ফকীহগণের বর্ণিত সর্বসম্মত কারণ।[৩৮] এখানে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার বিষয়টি মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত অন্য একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় হারাম করা হয়েছে যেহেতু মানুষ ভক্ষণ করা হারাম[৩৯] অথবা মানুষ নিজেই নিজের বেশি হকদার[৪০] অথবা মানুষ কারো মালিকানাধীন সম্পত্তি নয়,[৪১] এ ধরনের প্রত্যেকটি কারণ মৌলিক একটি কারণকে জোরদার করে, তা হচ্ছে মানুষের মান-মর্যাদা ও সম্মানের সংরক্ষণ। আর এ জন্যই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় হারাম করা হয়েছে। ইবন কুদামা র. এর যে উক্তির উপর ভিত্তি করে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার যুক্তি দেখানো হয়েছে তা এক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ সেখানে যে কর্তিত অঙ্গের কথা বলা হয়েছে তা হলো কার্যত বিচ্ছিন্ন, এ ধরনের অঙ্গ নিঃসন্দেহে কোনো উপকারে আসে না। কিন্তু এখানে যে কর্তিত অঙ্গের আলোচনা চলছে তা মূলত তা, যা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যেই কর্তন করা হয়েছে।[৪২]

দ্বিতীয়ত : মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার ক্ষেত্রে অপর একটি যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এর মাধ্যমে যে উপকার সাধিত হয় তা ইসলামী আইনে অনুমোদিত এবং যেহেতু তা দান করা যায় কাজেই তা ক্রয়-বিক্রয়ও করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে দানের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের তুলনা করা সঠিক নয়। ইসলামী আইনের একটি মৌলিক ধারা হচ্ছে, "বিক্রয়যোগ্য বস্তু মাত্রই দান করার উপযুক্ত, কিন্তু এর বিপরীতে দান করার উপযুক্ত বস্তু মাত্রই বিক্রয়যোগ্য নয়"। তাই মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করার অনুমতি থাকলেও বিক্রয় করার অনুমতি নেই। এছাড়াও এমন অনেক বস্তু রয়েছে যা শুধু দান করা যায়, কিন্তু বিক্রয় করা যায় না।[৪৩]

তৃতীয়ত : মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার ক্ষেত্রে তৃতীয় যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তার মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক তখনই হবে যখন শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যেই করা হবে। কিন্তু একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির আরোগ্য লাভের

---

৩৮. *বাদাঈ' আস্-সানাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪০; *আল-মাজমু'*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪২; আবদুর রাহমান আল-মাগরিবী, *মাওয়াহিবুল জালীল*, আল-কাহেরা : দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১৩২৯, খ. ৪, পৃ. ২৬৫; ইবন কুদামা, *আল-কাফী*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০১, খ. ২, পৃ. ৭

৩৯. ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ.১০৩

৪০. মাওয়াহিবুল জালীল, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৬৩

৪১. আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৮৩

৪২. ড. আবদুর রহমান দুয়াইনী, *কাদায়া মু'আসারাহ*, প্রাগুক্ত

৪৩. প্রাগুক্ত

উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টির আসল রূপ বজায় রেখে যথাস্থানে সংযোজনের নিয়তে যদি লেনদেন করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে তা মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। তবে প্রকৃত অর্থে এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। ধন-সম্পদ অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় কিভাবে হতে পারে? মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার যদি সৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে বিনিময় নেয়াকে সে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই বিনিময় ছাড়া তা দান করতো। ধরে নেয়া যাক, লেনদেনের মধ্যে কারো সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তা অত্যন্ত দূর্লভ। এর উপর ভিত্তি করে শরীয়তের কোনো বিষয়ে হুকুম দেয়া যেতে পারে না। তথাপিও তা বৈধকরণের মাধ্যমে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশাল এক ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। স্বল্প পরিশ্রমে প্রচুর আয়ের লোভে স্থানে স্থানে মানুষ চাষের ফার্ম শুরু হয়ে যাবে, মানুষ বিশেষ করে শিশু অপহরণ প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। ধন-সম্পদের লোভ মানুষের বিবেককে নিঃশেষ করে দেয় এবং যাবতীয় মহৎ গুণাবলীকে ধ্বংস করে দেয়। তাই মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করে আবার তার সম্মান ও মান-মর্যাদা খুঁজে বেড়ানোর কোনো অবকাশ নেই।[৪৪]

আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে আমরা যে সকল সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হলো :

- মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় ইসলামী আইনে বৈধ নয়।
- মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক।
- মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু নয়।
- মানুষ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নয়, প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ।
- মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা ধ্বংসাত্মক এক ব্যবসার সূচনা করবে।
- মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা মানুষ বিশেষ করে শিশু অপহরণের পথ সুগম করবে।[৪৫]
- সাদ্দুয যারায়ি' তথা সম্ভাব্য সকল খারাপ কাজের ছিদ্র পথ বন্ধ করা ইসলামী আইন গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর ভিত্তিতে উল্লিখিত সম্ভাব্য খারাপ পথের দ্বার বন্ধ করার লক্ষ্যেই মানুষের একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হতে পারে না।[৪৬]

---

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে লেনদেন হওয়ার কারণে ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কি পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করতে দেখুন: ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯৬

৪৬. ড. আবদুর রহমান দুয়াইনী, *কাদায়া মুয়াসারাহ*, প্রাগুক্ত

জীবিত অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় করা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ, কারণ মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসার বস্তু নয়। এর উপর ভিত্তি করে জীবিত অবস্থায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজনের তাগিদে অপরকে দান করাও হারাম হবে কী? অন্যথায় ইসলামী আইনে এর বিধান কী? এ নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা ইসলামী আইনে দুই ধরনের মতামত খুঁজে পাই:

প্রথম অভিমত

কিছু সংখ্যক মুসলিম আইনবিশারদ মনে করেন, বিনিময়সহ অথবা বিনিময় ছাড়া কোনো অবস্থায়, চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও, জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে অপরের দেহে সংযোজন করা বৈধ নয়।[৪৭] যে সকল দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তারা অবৈধ হওয়ার উপর মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ:

দলীল

এক : উপরোক্ত মতের উপর দলীল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত অভিমত পেশ করেন : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু"।[৪৮] অন্যত্র বলা হয়েছে : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "তোমরা নিজেরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা সদাচরণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালোবাসেন"।[৪৯] এখানে মহান আল্লাহ মানুষকে আত্মহত্যা করতে এবং নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিপতিত করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের দেহের কোনো অঙ্গ অপরকে দান করবে, নিঃসন্দেহে সে অপরকে বাচাঁতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবে। অথচ তার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি। শুধু নিজের হেফাজতের দায়িত্বই তাকে দেয়া হয়েছে।[৫০]

পর্যালোচনা

- উল্লেখ্য যে, এখানে যারা দান করা বৈধ হওয়ার পক্ষে অভিমত দেন তারাও নিঃশর্তভাবে তা বলেননি, বরং দাতার কোনো ক্ষতি না হওয়ার শর্তেই তারা এ ক্ষেত্রে দান করার বৈধতার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

---

৪৭. জায়েয না হওয়ার যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ড. হাসান আলী শায্লী, ড. আবদুস সালাম আব্দুর রাহীম, শাইখ শা'রাওয়ী, ড. আবদুর রহমান আদওয়ী, ড. আবদুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস এবং ড. মোস্তফা মুহাম্মদ যাহবী প্রমুখ

৪৮. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

৪৯. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

৫০. আবদুস সালাম আবদুর রাহীম আস-সুকারী, *নাকল ও যারা'আত আল-আ'দা আল-আদমিয়্যাহ মিন মানযুর ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

- এ ছাড়াও ডুবন্ত, ধ্বংসস্তুপের নিচে পতিত, আগুনে দগ্ধ ইত্যাদি অবস্থায় মানুষকে বাচাঁনোর জন্য ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে, অথচ এমতাবস্থায় উদ্ধারকারী ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। আহত-নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম মানুষের উপর জিহাদ আবশ্যক করেছে।

দুই: জীবিত অবস্থায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা অবৈধ হওয়ার অপর একটি যুক্তি হচ্ছে, মানুষের কোনো একটি অঙ্গ কেটে ফেলার মাধ্যমে অবশ্যই তার ক্ষতি হয়, চাই তা সিঙ্গেল হোক বা ডাবল। মহান আল্লাহ কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মানবদেহের গঠনতত্ত্ব (Anatomy) অনুযায়ী মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নির্ধারিত কাজ আছে, অঙ্গচ্ছেদের ফলে মানবদেহ এ সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হয়, যা দেহের জন্য ক্ষতিকর। আর কারো ক্ষতি করা রসূলের স. ভাষায় নিষেধ। ইসলামী আইনের অন্যতম মৌলিক ধারা হচ্ছে, "একজনের ক্ষতি করে অপরের ক্ষতি দূর করা যাবে না"। ক্ষতির মাধ্যমে ক্ষতি দূর করা নয়, বরং লাভের বিনিময়ে ক্ষতি দূর করা চাই"।[৫১]

পর্যালোচনা : যারা এ ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করাকে বৈধ বলেছেন উপরোক্ত দলীলের বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো : এ সকল অপারেশনের বৈধতা অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ। তন্মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে, দাতাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং এমন হতে হবে যে, একটি অঙ্গের কর্তন অন্য অঙ্গের উপর বিশেষে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবুও অন্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য হলেও থেকে যাবে। কিন্তু তা বৈধতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না, কারণ অনুরূপ সম্ভাবনা সুস্থ মানুষের দু'টি অঙ্গ থাকা অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে। অসুস্থ ব্যক্তির বৃহৎ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে এ জাতীয় সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়া সমীচীন হবে না।[৫২]

তিন: যুক্তি প্রমাণ হিসেবে তারা আরো বলেন, মানুষের শরীর থেকে অপরের জন্য অঙ্গচ্ছেদন করা, এটা অপরের মালিকানাধীন সম্পদে এক ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ। কারণ যদি কোনো মানুষের অনুমতি ব্যতীত তার শরীরকে অঙ্গহানি করা হয় তাহলে এটা ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হবে, যার জন্য দিয়াত বা কিসাস আবশ্যক হবে। আর যদি তার অনুমতিক্রমে করা হয় তাও জায়েয হবে না, কারণ এতে মালিকানাধীন নয় এমন বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা হয়। মূলত মানুষ তার দেহ কিংবা দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নয়, আল্লাহ হচ্ছেন প্রকৃত মালিক। এ জন্যই আল্লাহ যে কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করাকে মানুষের উপর হারাম করেছেন।[৫৩]

---

[৫১]. ড. আবদুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস, *আত-তাদাওয়ী বিল মুহাররামাত*

[৫২]. ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৫

[৫৩]. শাইখ মুহাম্মদ শারাওয়ী, *আল-ফাতাওয়া*

পর্যালোচনা : এটা সত্য যে, মানুষের দেহ আল্লাহর মালিকানাধীন। কিন্তু মানুষ এর থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকারী। তাই কারো যদি কোনো ক্ষতি না হয় এমতাবস্থায় তার এ অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া অবৈধ হবে না। মানুষের রক্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দান করার মাধ্যমে তার যদি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না হয়, বরং এর বিপরীতে অপরের লাভ হয় তাহলে এমতাবস্থায় তা দান করা অবৈধ হবে না।

চার : জীবিত অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করার অবৈধতার ক্ষেত্রে আরো যে যুক্তি দেয়া হয় যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তরের ফলাফল এখনো ধারণাপ্রসূত এবং অনিশ্চিত। এখনো পর্যন্ত কোনো ডাক্তার নিশ্চিত করে বলতে পারেনি যে, মানুষের এ ধরনের অঙ্গহানি করা সম্পূর্ণরূপে বিপদমুক্ত। এমনিভাবে কেউ নিশ্চিত নয় যে, অপরের দেহে অঙ্গ সংযোজন সম্পূর্ণ নিরাপদ চিকিৎসা। এ ধরনের অপারেশন যদিও সফল হয় তবুও কর্তিত অঙ্গ অপরের দেহে স্থাপনের জন্য নিয়মিত যে ঔষধপত্র ব্যবহার করতে হয় তা শরীরের জন্য আদৌ নিরাপদ নয়। উভয় পক্ষের ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা এ জাতীয় অপারেশনের গুরুত্ব ও ফলাফলকে ম্লান করে দেয়।[৫৪]

পর্যালোচনা : যারা এ জাতীয় অপারেশন বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন তারা তখনি বৈধ হওয়ার কথা বলেন যখন এর মাধ্যমে কারো উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এর মাধ্যমে যদি কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ হবে না।

পাঁচ : যারা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর অবৈধ হওয়ার কথা বলেন তারা একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন, ইসলামী আইনের সকল মাযহাবের আইনবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায়ও কাউকে বাচাঁনোর জন্য নিজের শরীরের অঙ্গহানি করা কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না।[৫৫]

পর্যালোচনা : উপরোক্ত অবৈধতা সেখানেই হবে যেখানে এর মাধ্যমে যার অঙ্গহানি করা হচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কারণ একটি জীবন বাচাঁনোর তাগিদে অন্য একটি জীবন শেষ করা যাবে না। উভয়েরই বেঁচে থাকার সমান অধিকার রয়েছে।

ইসলামী আইনবিদগণ যে অবস্থায় উপরোক্ত মতামত দিয়েছেন তা হচ্ছে, সফর অবস্থায় কোনো কাফেলা যদি পথ হারিয়ে ফেলে এবং রসদপত্র ফুরিয়ে মৃত্যুর উপক্রম হয় তাহলে এমতাবস্থায় সবাই মিলে একজনের শরীরের গোশত ভক্ষণ করা

---

৫৪. ড. হাসান আল-শায্লী, প্রাগুক্ত

৫৫. *মাজমাউল আনহুর শরহে মুলতাকাল আবহুর*, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৫২৫; *বুলগাতুস সালেক*, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৫২৯; ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬০১; মুহিউদ্দিন আন নাবাবী, *রাওদাতুন তালিবীন*, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২৮৫

বৈধ হবে না। জীবনের প্রশ্নে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু শাফিঈ মাযহাবের আইনবিদগণ এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার পরিমাণ নিজের শরীর থেকে ভক্ষণ করার বৈধতা দিয়েছেন। পুরো শরীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে কিছু ধ্বংস হয়ে বাকীটুকু বেঁচে থাকা উত্তম।[৫৬]

ড. আলী জুম'আ মুহাম্মদ প্রদত্ত সমাধান

মিশরের বর্তমান রাষ্ট্রীয় মুফতী ড. আলী জুম'আ মুহাম্মদ বলেন, আমি মনে করি, মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ হবে না। ক্রয়-বিক্রয়, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি মালিকানার শর্তেই বৈধ হয়। কিন্তু মানুষ তো তার দেহের মালিক নয়, এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এ কারণে মানুষের জন্য আত্মহত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ। তাই অপরের মালিকানাধীন দেহ এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় ও উপহার-উপঢৌকনের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা মানুষের জন্য বৈধ নয়।

এখন বলা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি থেকে জীবিত ব্যক্তির চক্ষু ব্যতীত অন্য কিছু স্থানান্তর করা অসম্ভব। এখনো পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান মৃত ব্যক্তি থেকে জীবিতের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর করতে সক্ষম নয়। অপর একটি বিষয় হচ্ছে, জীবিত ব্যক্তি থেকে জীবিতের জন্য স্থানান্তর, ক্রয়-বিক্রয়, উপহার, উপঢৌকনসহ যাবতীয় লেনদেন অবৈধ।

যখন কোনো ব্যক্তির দু'টি কিডনীই অকেজো হয়ে পড়ে এবং অপারেশন করানোর সামর্থ্য থাকে না তখন কী করা যেতে পারে? আমরা বলব, ডাক্তারী অপারেশন না করলে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ অপারেশন করে যদি নতুন কিডনী লাগানো হয় তাহলেও এ অবস্থায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এবং এ জাতীয় অপারেশনে সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম। অপারেশন সফল হলেও দু'এক বছরের বেশী সাধারণত বাঁচে না। মৃত্যুর এ আশংকা দূর করার জন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজের আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ নেই, এ জন্য আমি তা জায়েয মনে করি না। এখানে রক্তপণের উপর তুলনা করে এ কথা বলা যাবে না যে, মানুষের প্রতিটি অঙ্গেরই মূল্য আছে। তাই মানুষের মান-মর্যাদার কারণে বিক্রি করা বৈধ না হলেও বিনা মূল্যে তা দান করা অবৈধ হবে না। কারণ রক্তপণের মধ্যে যে মূল্য নেয়া হয় তা মূলত অপরাধ কার্যের শাস্তি স্বরূপ নেয়া হয়, ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের বিনিময় হিসেবে নেয়া হয় না। এমনিভাবে নিরূপায় অবস্থায় মৃত জন্তু ভক্ষণ করার উপরও তুলনা করা যাবে না, কারণ তা মানুষের উপর অকস্মাৎভাবে আপতিত বিষয়, এর উপর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনা চলে না। তথাপিও এমতাবস্থায় মানুষের মত সম্মানিত ও মর্যাদাবান নয় এমন জন্তুরই গোশত খাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনা চলছে জীবিত মানুষের শরীরে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে, যার মাধ্যমে মূলত মানুষের খুচরা যন্ত্রাংশের (Spare Parts) লেনদেনের সূচনা করা হয়।

---

৫৬. রাওদাতুন তালিবীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮৪

এ অবস্থা প্রাথমিকভাবে মানুষের চরিত্র কলুষিত করবে এবং পরিণামে মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ নিঃশেষ করে দিবে। মিশরস্থ ইসলামিক রিচার্স একাডেমীও এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে, যদিও কোনো কোনো সভ্য এর বিপরীত রায় দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে তা অবৈধ। কারণ এর মাধ্যমে মানবদেহ নিয়ে ঘৃণিত এক ব্যবসায়-বাণিজ্য, নারী, শিশুসহ মানুষ অপহরণ, মানুষকে অপরহণ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখাসহ অনেক পাপাচারের জন্ম হবে। তাই তা বৈধকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন পাপাচারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া সমীচীন হবে না। ইসলামী আইনের মৌলিক ধারা "সাদ্দুয যারায়ি' তথা সম্ভাব্য বিভিন্ন খারাপ কাজের দ্বার বন্ধ করা' এ মূলনীতির আলোকে উল্লিখিত সম্ভাব্য খারাপ পথের দ্বার বন্ধ করার লক্ষ্যেই মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়, উপহার-উপঢৌকনসহ যাবতীয় লেনদেন বৈধ হতে পারে না।[৫৭]

দ্বিতীয় অভিমত

এ মতের প্রবক্তাগণ শর্তসাপেক্ষে জীবিত অবস্থায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরকে দান করা বৈধ মনে করেন। তবে এ ক্ষেত্রে মানুষের মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যার থেকে অঙ্গ নেয়া হচ্ছে তার যাতে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত শর্তাবলি হচ্ছে:[৫৮]

- অঙ্গ দানকারীর সন্তুষ্ট থেকে এ কাজ করতে হবে। সে প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
- অঙ্গ দানকারীর অঙ্গ নেয়ার পর তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে বিঘ্ন ঘটে এ ধরনের ক্ষতি হতে পারবে না। এ ভিত্তিতে যে অঙ্গ নিলে তার প্রাণহানি ঘটবে যেমন হার্ট ইত্যাদি, এমন অঙ্গ নেয়া নিঃশর্তভাবে জায়েয হবে না। এমনিভাবে যে অঙ্গগুলো একক সেগুলো নেয়া যাবে না, কারণ এগুলো নেয়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু না ঘটলেও শরীর তার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে না। ইসলামী আইনের মৌলিক একটি ধারা হচ্ছে, কোনো ক্ষতি তার সমপরিমাণ ক্ষতি সহ্য করে দূর করা যাবে, কিন্তু এর থেকে বেশি ক্ষতি বহন করে তা দূর করা জায়েয হবে না। ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের কথাই ধর্তব্য হবে।
- অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে অঙ্গ সংযোজনই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় বলে বিবেচিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রাথমিক অন্যান্য যাবতীয় উপায়গুলো প্রয়োগ করে দেখতে হবে।

---

৫৭. মুফতী ড. আলী জুম'আ মুহাম্মদ, *আল-কালিম আত্-তাইয়্যেব*, আল-কাহেরা : দারুস সালাম, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২৯৭

৫৮. ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, *ফুখতারাত ফিল ফাতাওয়া ওয়াল বুহুছ*, আল-কাহেরা : মাজমা আল-বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ, ফাতওয়া নং ১৩২৩, ১৯৭৯; ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

- যার জন্য অঙ্গ সংগ্রহ করা হচ্ছে সে এ ক্ষেত্রে নিরূপায় হতে হবে। যেমন এভাবে না করলে তার প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।
- স্থানান্তর ও সংযোজন উভয় অপারেশনের সফলতা সম্পর্কে সাধারণত নিশ্চিত হতে হবে অথবা সফলতার হার ব্যর্থতার চেয়ে বেশি হতে হবে। তাই পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের উপর এ ধরনের অপারেশন চালানো বৈধ হবে না।
- এ ধরনের অঙ্গ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না। পুরোটাই দান করতে হবে। যেহেতু মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের মান-মর্যাদার হানি ঘটে, তাই বিনিময় গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অনেকেই শর্তারোপ করেছেন এমন অঙ্গ হতে হবে যা চিকিৎসার জন্য এমনিতেই তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, কিন্তু এর মাধ্যমে অন্যের উপকার সাধন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তার শরীরের অঙ্গটি কবরস্থ না করে অন্যের উপকারে লাগানোই উত্তম হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলীর আলোকে জীবিত মানুষের জন্য তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনিময় ছাড়া অপরকে দান করা বৈধ হবে। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ আধুনিক মুসলিম ফকীহ, অধিকাংশ ফিক্‌হ একাডেমী, ফতোয়া বোর্ড এবং ইসলামিক রিচার্স একাডেমীসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত।[৫৯] যে সকল দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তারা জায়েয হওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ:

দলীল

এক: যদিও মানুষ তার দেহের সত্যিকার মালিক নয় তবুও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দেহ থেকে সঠিক উপায়ে উপকৃত হওয়ার অধিকার তাকে প্রদান করেছেন। শরীয়তে নিষিদ্ধ উপায়গুলো যেমন: নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা, আত্মহত্যা করা ইত্যাদি এড়িয়ে স্বাধীনভাবে নিজের দেহে হস্তক্ষেপ করা মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ। তাই মানুষের রক্ত, চামড়া বা এমন কোনো অঙ্গ যার অনুপস্থিতিতে তার তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তার জীবনও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে না, বিপরীতে তা একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির মধ্যে জীবনের আশার সঞ্চার করতে পারে, এ ধরনের হস্তক্ষেপ

---

৫৯. বৈধতার পক্ষে যাঁরা মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: সাবেক শাইখুল আজহার ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ আত-তানতাভী, আজহারের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ড. আহমদ ওমর হাশিম, আয্হারের ফাতওয়া বিভাগের সাবেক প্রধান শাইখ আতিয়া সাকার এবং ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার প্রমুখ। এ ছাড়া যে সকল ফিক্‌হ একাডেমী বৈধতার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা হলো: রাবেতা আলম ইসলামী, মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী, সেমিনার ১৯-২৮ জানুয়ারী, ১৯৮৫, ফতোয়া বিভাগ, জর্দান, ১৯৭৭, ফতোয়া কমিটি, আলজেরিয়া ১৯৭২ ইত্যাদি

শুধু বৈধ নয়, বরং রীতিমত প্রশংসনীয়ও বটে। ইসলামে জিহাদের আবশ্যকতা এর বড় প্রমাণ। আহত নিহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ এর থেকে বড় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা আবশ্যক করেছেন। এমনিভাবে ইসলাম মানুষকে অপরের বিপদ-আপদে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয় এবং একে মহৎ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও এখানে উদ্ধারকারী ব্যক্তির ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।[৬০]

পর্যালোচনা: মানুষ তার দেহে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত নয়। কোনো জিনিস থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া, কাউকে কোনো কিছু দান করা অথবা কোনো কিছু বিক্রয় করা ইত্যাদির জন্য ঐ জিনিসের মালিকানা শর্ত। অথচ মানুষ তার দেহের মালিক নয়, প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষের শুধু তার দেহ থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে, অন্য কিছু নয়। তাই মানুষ ইচ্ছে করলেও নিজেকে ধ্বংস করতে কিংবা হত্যা করতে পারবে না। এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।[৬১]

পর্যালোচনার জবাব : উপরোক্ত পর্যালোচনার জবাবে বলা যেতে পারে, যা বলা হয়েছে মানুষ তার দেহের প্রকৃত মালিক নয়-এ কথাটি মূলত প্রমাণভিত্তিক স্বতঃসিদ্ধ কোনো কথা নয়। মানুষ যে জিনিসটির মালিক নয় তা হচ্ছে তার জীবন এবং তার আত্মা বা রূহ। এ জন্য মানুষ নিজেকে ধ্বংস করতে বা আত্মহত্যা করতে পারবে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মানুষ নিজেই এগুলোর মালিক। ক্ষতিকর নয় এমন সকল কাজে মানুষ এগুলোকে তার স্বাধীন ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারবে। ইসলাম মানুষকে নিজের এবং অপরের উভয়ের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।[৬২]

দুই : প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরূপায় অবস্থায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ "যে সব জিনিস নিরূপায় অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায় হারাম করা হয়েছে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন"।[৬৩] ইসলামের মৌলিক বিধান হচ্ছে, মানুষ সম্মানিত এবং তাকে স্পর্শ করা যাবে না, কিন্তু প্রয়োজনের নিরিখে অপর মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে তাকে স্পর্শ করা যাবে এবং তার অঙ্গ স্থানান্তর করা যাবে। প্রয়োজন হারাম জিনিসকে হালাল করে দেয়। বড় কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সামান্য ক্ষতিকে সহ্য করতে হবে। তাই কোনো মানুষের অঙ্গ স্থানান্তরের মাধ্যমে যদি অপর মানুষের বড় কোনো সমস্যার

---

[৬০] ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, *বায়ান লিন নাস*, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৩১৬

[৬১] শাইখ শা'রাওয়ী প্রদত্ত সমাধান, *আকীদাতী পত্রিকা*, আল-কাহেরা, আগস্ট সংখ্যা, ১৯৯৬

[৬২] ড. সাইয়েদ তানতাভী, ফাতাওয়া শরীআহ, বায়ান লিন নাস, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৪

[৬৩] আল-কুরআন, ৬ : ১১৯

সমাধান করা যায় তাহলে তার বৈধতার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো আপত্তি নেই। অভিজ্ঞ ডাক্তারই এ ক্ষেত্রে তুলনা করতে পারবে।[৬৪]

পর্যালোচনা: উল্লিখিত এ প্রয়োজন মানুষের অঙ্গ কেটে স্থানান্তরের বৈধতার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ এর মাধ্যমে যার অঙ্গ স্থানান্তর করা হচ্ছে সে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। একটি ক্ষতিকে অপর একটি ক্ষতির মাধ্যমে দূর করা বৈধ নয়।[৬৫]

জবাব: এ পর্যালোচনার জবাবে বলা যেতে পারে, যারা বৈধতার কথা বলেছেন তারা নিঃশর্তভাবে বলেননি। যদি এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা স্থানান্তর কখনো বৈধ হবে না। এছাড়াও সকল অঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ নয়, বরং যেগুলো স্থানান্তর করলে শরীরের উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যা হবে না শুধু সেগুলোর স্থানান্তর বৈধ হবে।[৬৬]

তিন: যারা মানুষের অঙ্গ স্থানান্তর বৈধ মনে করেন তাদের অপর একটি দলীল হচ্ছে, এর মাধ্যমে মানব সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির সুবাতাস প্রবাহিত হয়।[৬৭] মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "তোমরা ভাল ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না"।[৬৮]

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তরের বৈধতায় ইসলামী আইনের মৌলিক ধারাসমূহ[৬৯]

- প্রয়োজন (Exigency) হারাম বস্তুকে হালাল করে দেয়।
- ক্ষতি অবশ্যই অপসারণযোগ্য।
- কষ্টই সহজ হওয়ার পথ সুগম করে দেয়।
- কল্যাণের পথে যদি সামান্যতম ক্ষতি হয় তাহলে সে ক্ষতি সহনীয়।
- দু'টো সম্ভাব্য ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে অল্প ক্ষতিকে সহ্য করে বেশি ক্ষতিকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে।
- দু'টো কল্যাণ সাংঘর্ষিক হলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কল্যাণটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে।
- নিজের কিংবা অপর কারো ক্ষতি করার কোনো সুযোগ নেই।

---

৬৪. শাইখ আতিয়া সাকার, *আহসানুল কালাম ফিল ফাতাওয়া*, আল-কাহেরা : মাকতাবাহ আত-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৩৫২

৬৫. ড. আবদুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস, প্রাগুক্ত

৬৬. ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, *বায়ান লিন নাছ*, প্রাগুক্ত

৬৭. ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, *আল-মাওকাফ আল-ফিক্হী ওয়াল আখলাকী মিন কাদিয়্যাত যার' আল-আ'দা*, প্রাগুক্ত

৬৮. আল-কুরআন, ৫ : ২

৬৯. ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*; আস-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*, শাতেবী, *আল-মুয়াফাকাত*

- পারস্পরিক সহযোগিতা সর্বদাই কাম্য এবং প্রশংসনীয়।
- যেখানেই মানুষের কল্যাণ সেখানেই শরীয়ত। অর্থাৎ যে কাজের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ হয় সে কাজ ইসলামে বৈধ, যদি এর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক কোনো বিধানের লঙ্ঘন না ঘটে।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে জীবিত অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করার ক্ষেত্রে আমরা যে সকল সিদ্ধান্তে আসতে পারি:

- জীবিত অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরকে দান করা বৈধ হবে, তবে এ ক্ষেত্রে দানকারীকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে এবং দানকারীর প্রাণহানি ঘটে কিংবা জীবনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ করে দেয় এমন অঙ্গ দান করা বৈধ হবে না।
- দান করার ক্ষেত্রে বিনিময় হিসেবে কোনো কিছু গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।
- যে উদ্দেশ্যে অঙ্গ স্থানান্তর করা হচ্ছে তা যাতে সফল হয় এবং এ ক্ষেত্রে দানকারীর যাতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে হবে।[৭০]

মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান

জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষের মান-মর্যাদা

কুরআন-হাদীস বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, মানুষ আবেগ অনুভূতি সম্পন্ন রক্ত গোশতে গড়া প্রাণী। এ দেহকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় খুবই সম্মানিত ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে। এ জগৎ সংসারের সব কিছুকে আল্লাহ মানুষের সেবার নিমিত্তে তার আয়ত্তাধীন করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

রসূলুল্লাহ স. মৃত অবস্থায় মানুষের অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন। ইহুদীরা রসূলের স. ঘোর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও একদা এক ইহুদীর লাশের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় রসূলুল্লাহ স. তার জানাযার সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক সাহাবী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললন, এটা ইহুদীর মৃতদেহ। রসূল স. উত্তর দিলেন, এটা কি মানবাত্মা নয়?[৭১] এমনিভাবে রসূলুল্লাহ স. মৃত দেহের হাড় ভাঙ্গতে নিষেধ

---

৭০. ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, *ফাতাওয়া মুয়াসারাহ*, দিমাস্ক : দারুল কালাম, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৫৩৩; শাইখ আতিয়া সাকার, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৮; ড. আহমদ মুরাকিব দাউদ আবিদ, *আল-আকওয়াল আল-ফিকহিয়্যাহ ফি নাকল ওয়া যার' আল-আ'দা আল-বাশারিয়্যাহ*, আল-ফাল্লুজা : মাজাল্লাত কুলিয়্যাহ আল-উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৯, পৃ. ৩৭০-৩৭২

৭১. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : মান কামা লি জানাজাতি ইহুদী, হাদীস নং ১৩১১, ১৩১২

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنهما – قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – وَقُمْنَا بِهِ . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ . قَالَ « إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

করেছেন। একদা কবর খননের সময় কিছু হাড় পাওয়া গেলে খননকারী তা ভাঙ্গতে চাইলে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "এগুলো ভেঁঙ্গে ফেলো না, মৃত অবস্থায় তা ভাঙ্গা জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার অনুরূপ"।[৭২]

ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় সম্মান দান করেছে এবং মানুষকে অপমান করতে, এর মর্যাদার হানি করতে এবং অত্যাচারসহ যাবতীয় কষ্ট দিতে বারণ করেছে। মৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন, জানাযা পড়া এবং তাড়াতাড়ি কবরস্থ করার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে ইসলাম মৃত মানুষকেও মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।[৭৩]

মৃত ব্যক্তির অঙ্গ স্থানান্তরের বৈধতার ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের অভিমত

ইসলাম যেহেতু মানুষকে মৃত অবস্থায়ও সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করেছে, তাই মৃত ব্যক্তির অঙ্গ স্থানান্তর করা যাবে কিনা, এর থেকে প্রয়োজনে উপকৃত হওয়া যাবে কিনা, এ বিষয়ে মুসলিম স্কলারদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এখানে দু'টি মতামত পাওয়া যায়:

প্রথম মত

যদি মৃতদেহ থেকে নেয়া অঙ্গের মাধ্যমে জীবিত ব্যক্তির কোনো উপকার সাধন সম্ভব হয়, তাহলে মৃতদেহ থেকে অঙ্গ স্থানান্তর করে জীবিত ব্যক্তির দেহে তা সংযোজন করা বৈধ হবে।[৭৪] কিন্তু এ ধরনের অঙ্গ স্থানান্তর শর্তসাপেক্ষে বৈধ।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا . فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ . فَقَالَ « أَلَيْسَتْ نَفْسًا » .

৭২. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : ফিল-হাফফার...., প্রাগুক্ত

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

৭৩. ড. আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৭৪. বৈধতার পক্ষে যারা মত দিয়েছেন: শাইখ ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, *আল-ফাতাওয়া আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ১০, পৃ. ৩৭০২; ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাভী, *ফাতাওয়া আশ-শারঈয়্যাহ*, পৃ. ৫০; মালয়শিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে গৃহীত সিদ্ধান্ত, এপ্রিল, ১৯৬৯; আলজেরিয়ার সুপ্রিম ইসলামিক কাউন্সিল প্রদত্ত ফাতওয়া, ২০এপ্রিল ১৯৭২; শাইখ মুহাম্মদ খাতের, মুফতী মিশর, ২/২/১৯৭২; সৌদি আরবস্থ সুপ্রিম উলামা কাউন্সিল প্রদত্ত ফাতওয়া, ৬ যুল কা'দাহ, ১৪০২ হি.। ড. হাসান আল-শাযলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৬; ড. আবদুর রাহীম আবদুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪; ড. আবদুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

মৃতদেহ থেকে অঙ্গ স্থানান্তরের বৈধতায় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

- যার জন্য অঙ্গ সংগ্রহ করা হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সে নিরূপায় হতে হবে। এই অঙ্গের মাধ্যমে চিকিৎসা না করলে তার প্রাণহানি অথবা উল্লেখযোগ্য বড় কোনো ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকতে হবে।
- মানবদেহ ছাড়া অন্য কোনো মৃতদেহ পাওয়া না গেলে, যার মাধ্যমে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব, এমতাবস্থায় যদি এমন কোনো মৃতদেহ পাওয়া যায় যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পাদন করা সম্ভব তাহলে মৃত মানবদেহ থেকে তা সংগ্রহ করা জায়েয হবে না।
- চিকিৎসার জন্য এটাই একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।
- মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ ও অনুমতি সন্তুষ্টচিত্তে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়াত করে যেতে হবে। অন্যথায় মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। যদি অজ্ঞাত লাশ হয় এবং কোনো আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধির সন্তুষ্টিই যথেষ্ট হবে। অনুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় কোনো বাধ্য-বাধকতা ছাড়া সন্তুষ্টচিত্তে হতে হবে।
- মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহের অনুমতি সম্পূর্ণভাবে বিনিময় ছাড়া নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টির স্বার্থেই সওয়াবের আশায় হতে হবে। মানবদেহ জীবিত ও মৃত কোনো অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু নয়।[৭৫]
- মৃত ব্যক্তি থেকে অঙ্গ নেয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হওয়ার ব্যাপারে সার্বিকভাবে নিশ্চিত হতে হবে। অন্যথায় জীবিত ব্যক্তির উপর আক্রমণের অপরাধে অপরাধী হবে।

মৃতদেহ থেকে অঙ্গ স্থানান্তরের বৈধতার দলীল

যে সকল দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে মৃত ব্যক্তি থেকে অঙ্গ স্থানান্তরের বৈধতা দেয়া হয় তা নিম্নরূপ:

এক: মৃত থেকে জীবিত ব্যক্তির জন্য অঙ্গ স্থানান্তর চিকিৎসার নিমিত্তেই করা হয়। সার্বিকভাবে চিকিৎসা ইসলামী আইনে কাঙ্খিত এবং অনুমোদিত।[৭৬]

দুই: যদিও ইসলাম মানুষকে মৃত অবস্থায়ও মর্যাদার আসন দিয়েছে এবং পুরাতন কবর খননসহ মৃতদেহের উপর যাবতীয় বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করেছে, এছাড়াও মৃতকে আঘাত করা জীবিতকে আঘাতের সমপর্যায় বলে গণ্য করেছে, তথাপিও প্রয়োজনের তাগিদে একজন জীবিত মানুষের শরীরে সংযোজন করে তাকে বাচানোর লক্ষ্যেই মৃত

---

৭৫. ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ১, পৃ. ১২৪

৭৬. ড. আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

মানুষের অঙ্গ সংগ্রহ করা ইসলামের মেযাজে অবৈধ হবে না। এর মাধ্যমে বড় ক্ষতিকে অপসারণের লক্ষ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বরণ করে নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি হচ্ছে, জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর আশংকা এবং ছোট ক্ষতি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সম্মানহানি করা। নিঃসন্দেহে জীবিত মানুষের সম্মান ও জীবনের মর্যাদা মৃত মানুষের সম্মান ও মর্যাদার তুলনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

তিন: অধিকাংশ মুসলিম আইনবিশারদদের দৃষ্টিতে অপরের ভক্ষিত সম্পদ বের করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির পেট বিদীর্ণ করা বৈধ হবে যদিও তাতে মৃতের মর্যাদার হানি ঘটে। এরূপ করা যদি বৈধ হয় তাহলে একটি জীবন বাচাঁনোর ন্যায় মহৎ কাজের জন্য তার অঙ্গ সংগ্রহ করা অবশ্যই বৈধ হবে যদিও তাতে তার মর্যাদার হানি হয় বলে মনে হয়।[৭৭]

চার : হানাফী[৭৮], শাফিঈ[৭৯] ও হাম্বালী[৮০] মাযহাবের কতিপয় ফকীহ ও ইবন হাযম যাহেরী[৮১] প্রমুখের মতে কোনো মৃত মহিলার গর্ভে যদি ছয় মাসের অধিক বয়সের

---

৭৭. হানাফী মাযহাব, *আদ্-দুররুল মুখতার*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৮৪০; শাফিঈ মাযহাব, *আল-মাজমু*, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৩০১; মালিকী মাযহাব, *হাশিয়া দুছুকী আলা শারহে কাবীর*, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৩৭৬; হাম্বলী মাযহাব, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৩; ড. আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৭৮. ইবন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুর আল-মুখতার*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৬২৮

قال ابن عابدين في حاشيته: "حامل ماتت و ولدها حي يضطرب، يشق بطنها من الأيسر و يخرج ولدها، ولومات الولد في بطنها وهي حية و خيف على الأم قطع (للولد) و أخرج، بخلاف ما لوكان حيا أي إذا كان حيا لا يجوز تقطيعه".

৭৯. ইমাম শায়বানী, *মুগনী আল-মুহতাজ*, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২০৭

قال الشربيني في مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين للنووي: " أنه لو دفنت لمرأة و في بطنها جنين حي ترجى حياته بأن يكون له ستة أشره فأكثر، نبش قبرها و شق جوفها ولخرج تداركا للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن، و إن لم ترج حياته لم تنبش".

ইমাম নববী, *আল-মাজমু'*, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ৩০০

قال الإمام النووي في المجموع: "إذا ماتت إمرأة و في جوفها جنين حي يشق جوفها لأن استبقاءه بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا ما اضطر إلى أكل جزء من الميت".

৮০. সুলাইমান আল-মাকদাসী, *তাসহীহুল ফুরু'*, তা. বি., পৃ. ৬৯১; ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫১

وفي لمذهب لحنبلي جاء في تصحيح لفروع أنه إذا ماتت لمرأة حامل شق جوفها.

وجاء في لمعني لابن قدامة: يحتمل أن يشق بطن الأم (أي لميتة) إن غلب على لظن أن لجنين يحيا".

সন্তান থাকে এবং তার বেঁচে থাকা সম্পর্কে প্রবল ধারণা অর্জন করা যায় তাহলে মৃত মহিলার পেট বিদীর্ণ করে সন্তান বের করা বৈধ হবে। জীবনের মর্যাদা মৃতের মর্যাদার চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এমনিভাবে যদি ডাক্তারের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কোনো জীবনকে মৃতের কোনো অঙ্গের মাধ্যমে বাঁচিয়ে তোলার সম্ভাবনা পাওয়া যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে মৃতের অঙ্গ সংগ্রহ করা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের মৌলিক বিধানগুলো লক্ষ্যণীয়। যেমনঃ "প্রয়োজন হারামকে হালাল করে দেয়", "তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতি সহ্য করে বড় ক্ষতি দূর করতে হবে", ইত্যাদি।

পাঁচ : ইসলামের মৌলিক আইন হচ্ছে, দু'টি কল্যাণ যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত ছোট কল্যাণ ত্যাগ করে বৃহৎ কল্যাণের দিকেই ধাবিত হতে হবে। এখানে রোগীর জীবন বাচাঁনোর মধ্যেই বৃহৎ কল্যাণ নিহিত, তাই তা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে।[৮২]

দ্বিতীয় মত

জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানবদেহের কোনো অঙ্গ দান করা হারাম, কারণ উভয় অবস্থায় মানুষ তার দেহে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়।[৮৩] এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত অবস্থায় অঙ্গ স্থানান্তরে মুসলিম স্কলারদের মাঝে যে মতপার্থক্য তা জীবিত অবস্থায় অঙ্গ স্থানান্তরে বিদ্যমান পার্থক্যের সমপর্যায়ের নয়। অনেকেই যারা জীবিত অবস্থায় অবৈধ হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারাই শর্তসাপেক্ষে মৃত অবস্থায় বৈধ হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[৮৪]

মৃতদেহ থেকে অঙ্গ স্থানান্তরের অবৈধতার দলীল

এক : মৃত অবস্থায় মানুষের অঙ্গ স্থানান্তরের অবৈধতার দলীল হচ্ছে, এর মাধ্যমে মৃতের সম্মানহানি করা হয়। এছাড়াও মৃত ব্যক্তি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নয় যে সে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়াত করে যাবে। এমনিভাবে তার আত্মীয়-স্বজনও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নয়, তাই তাদের অনুমতিও এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে না।

---

৮১. ইবন হায্ম, *আল-মুহাল্লা*, তাহকীক : আহমদ শাকির, দারুল ফিক্র

قال ابن حزم في المحلى: "ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا و يخرج الولد، لقول الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا)، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس".

৮২. ড. আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮; ড. আলী আল-বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৮৩. শাইখ শারাওয়ী প্রদত্ত ফাতওয়া, আল-কাহেরা : *আল-লিওয়া আল-ইসলামী পত্রিকা*, জানুয়ারী ৮৭, ড. আবদুর রহমান আল-আদওয়ী, মিশর : ওযারাতুল আওকাফ, মিম্বারুল ইসলাম, আগস্ট ১৯৯২

৮৪. এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ ড. হাসান আল-শায্লী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৬; ড. আব্দুস সালাম সুকারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪; ড. আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

জবাব : উপরোক্ত দলীলের জবাবে বলা যেতে পারে যে, যদিও এর মাধ্যমে মৃতের অপমান হচ্ছে কিন্তু এ পরিমাণ ক্ষতির মোকাবেলায় প্রাপ্ত কল্যাণের পরিমাণ এর থেকে বেশী। তাছাড়া এরূপ না করলে অপর একটা জীবনের ইতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মৃতের সামান্য ক্ষতির মাধ্যমে যদি একটি জীবন বাচাঁনো যায় তাহলে তা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে। মালিকানার বিষয়ে পূর্বে এর জবাব দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে, আসলে মানুষ যে জিনিসটির প্রকৃত মালিক নয় তা হচ্ছে তার জীবন বা রূহ। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সে মালিক, সে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

দুই : অপর একটি দলীল যার উপর ভিত্তি করে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ স্থানান্তরের অবৈধতার যুক্তি দেয়া হয় তা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন "মৃত ব্যক্তির হাঁড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাঁড় ভাঙ্গার অনুরূপ"। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির যেমন কোনো ক্ষতি করা যায় না তেমনি মৃত ব্যক্তিরও কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

জবাব : উপরোক্ত দলীলের জবাবে বলা যেতে পারে, হাদীসে বর্ণিত হাঁড় ভাঙ্গা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিনা প্রয়োজনে অথবা গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কল্যাণ ব্যতীত মৃতের অঙ্গ সংগ্রহ করা। হাদীসে বর্ণিত ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। কবর খননকারী হাঁড় পেয়ে কোনো কারণ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবেই ভেঙ্গে ফেলতে চাইলে রসূলুল্লাহ স. তখন উপরোক্ত হাদীস বললেন এবং হাঁড় ভাঙ্গতে নিষেধ করলেন। কিন্তু যদি কোনো প্রয়োজন কিংবা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কল্যাণ থাকে তাহলে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির মান-মর্যাদা এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে আমরা যে সকল সিদ্ধান্তে আসতে পারি:

- মৃত ব্যক্তির অসিয়াতের মাধ্যমে অথবা আত্মীয়-স্বজনদের অনুমতিক্রমে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ হবে।
- বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই এ বৈধতা দেয়া হয়েছে।
- ইসলামী আইনের মৌলিক একটি ধারা হচ্ছে, "কল্যাণ এবং ক্ষতি যদি সাংঘর্ষিক হয় এবং কল্যাণ যদি ক্ষতির তুলনায় বেশি হয় তাহলে ক্ষতি মেনে নিয়ে কল্যাণ অর্জন করতে হবে।" এ ক্ষেত্রে একটি জীবন বাচাঁনো মৃত ব্যক্তির সম্মান রক্ষার তুলনায় অনেক বেশি।
- অঙ্গ স্থানান্তরের কাজ সম্পূর্ণ বিনিময় ছাড়া হতে হবে।
- অঙ্গ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ডাক্তার মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহের সময় প্রয়োজন পরিমাণ নিতে পারবেন এবং অত্যন্ত নম্র হাতে দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করবেন। সাথে

সাথে অপারেশন শেষে কর্তিত স্থান সেলাই করে দিতে হবে যাতে মৃতের অবমাননা না হয়।

- কোনো ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত দেয় যে, রোগী ক্লিনিক্যাল মৃত্যুবরণ করেছে বা তার ব্রেইন ডেথ হয়ে গেছে, যদিও এখনো রক্তসঞ্চালনসহ তার হার্ট সচল আছে, এমাতবস্থায় রোগী থেকে তার জীবন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যেমনঃ হার্ট, কলিজা, কিডনী, চোখের কর্ণিয়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে এগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষী জীবিত রোগীদের কল্যাণে তা ব্যবহার করা যাবে।[৮৫]

উপসংহার

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য বস্তু নয় বিধায় তা বিক্রি করা ইসলামী আইনে বৈধ নয়। কেননা একাজ মানুষের মান-মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। উপরন্তু মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা মানুষ বিশেষ করে শিশু অপহরণের পথ সুগম করবে। জীবিত অবস্থায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরকে দান করা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দানকারী ব্যক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে এবং দানকারীর প্রাণহানি ঘটে কিংবা জীবনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ করে দেয় এমন অঙ্গ দান করা বৈধ হবে না। দান করার ক্ষেত্রে বিনিময় হিসেবে কোনো কিছু গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। যে উদ্দেশ্যে অঙ্গ স্থানান্তর করা হচ্ছে তা যাতে সফল হয় এবং এ ক্ষেত্রে দানকারীর যাতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে হবে। মৃত ব্যক্তির অসিয়াতের মাধ্যমে অথবা আত্মীয়-স্বজনদের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ হবে। ইসলামী আইনের মৌলিক একটি ধারা হচ্ছে, "কল্যাণ এবং ক্ষতি যদি সাংঘর্ষিক হয় এবং কল্যাণ যদি ক্ষতির তুলনায় বেশি হয় তাহলে ক্ষতি মেনে নিয়ে কল্যাণ অর্জন করতে হবে"।[৮৬] এ ক্ষেত্রে একটি জীবন বাঁচানো মৃত ব্যক্তির সম্মান রক্ষার তুলনায় অনেক বেশী। তবে এক্ষেত্রে অঙ্গ স্থানান্তরের কাজ সম্পূর্ণ বিনিময় ছাড়া হতে হবে।

---

৮৫. ড. আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস, প্রাগুক্ত, ৩০৯; ইউসুফ আল-কারদাভী, *ফাতাওয়া মুয়াসারাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৬৫; *কারারাত মাজমা' ফিক্‌হ আল-ইসলামী আলা মাওত আদ-দিমাগ*

৮৬. প্রাগুক্ত

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

ইসলামী আইনে হিবা : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*
এ.এন.এম. মাসউদুর রহমান**

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলামী আইনে হিবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিকভাবে বসবাস করতে হলে পারস্পরিক লেনদেন যাতে সঠিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। হিবা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হলেও অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়। পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের মাঝে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ও সুসম্পর্ক স্থাপনের নিমিত্তে হিবা প্রদান ও গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর জীবদ্দশায় হিবা প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই করেছেন এবং হিবা যাতে উম্মতের মাঝে প্রচলিত হয় সে ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার ভিত্তিতে হিবার বৈধতা পাওয়া যায়। আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকজনকে হিবা প্রদান এবং তাদের নিকট থেকে হিবা গ্রহণও করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে হিবা-এর পরিচয়, প্রচলন, প্রকারভেদ, হুক্‌ম, রুক্‌ন, শর্তাবলি ও হিবা প্রত্যাহারের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]*

হিবা-এর পরিচয়

আল-হিবা (اَلْهِبَةُ) শব্দটির হা (هَاء) বর্ণে যের ও বা (بَاء) বর্ণে যবর দিয়ে পঠিত হয়। আভিধানিক অর্থ اَلشَّيْءُ اَلْمَوْهُوْبُ 'দানকৃত বস্তু',[১] هِبَةٌ 'দান করা'।[২] আল-জাওহারী র. বলেন, وهبت له شيئاً وَهْباً، ووَهَباً بالتحريك، وهبَةً অর্থাৎ আমি তাকে কোনো কিছু দান করলাম। وَهْبٌ শব্দটির হা বর্ণে সুকূন ও হরকত দিয়ে পড়া হয়। যার অর্থ দান। যেমন বলা হয়, ورجلٌ وَهَّابٌ ووَهَّابَةٌ، أي كثير الهبة لأمواله، والهاء للمبالغة. যদি বলা হয়, ورجلٌ وَهَّابٌ বা وَهَّابَةٌ তখন অর্থ হবে- এমন ব্যক্তি যিনি তার সম্পদকে অধিক পরিমাণে দান

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫

১. ড. হামিদ সাদেক ও ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ, *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা,* পাকিস্তান : ইদারাতুল-কুরআন, তা. বি., পৃ. ৪৯২; সা'দী আবূ জাইয়্যিব, *আল-কামূস আল-ফিক্‌হী,* পাকিস্তান : ইদারাতুল-কুরআন, তা. বি., পৃ. ৩৯০

২. *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২

করেন। এখানে 'হা' (ه) বর্ণটি مبالغة-(আধিক্যবাচক) এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] কারো কারো মতে, هِبَة শব্দটি ইসম জামেদ একবচন, বহুবচনে هِبَاتٌ।[৪]

হিবা এমন দান যা সকল প্রকার উদ্দেশ্য ও বিনিময় ছাড়া প্রদান করা হয়। যখন কেউ অধিক পরিমাণে দান করেন তাকে وَهَّابٌ বলা হয়। আর وَهَّاب শব্দটি আধিক্যবাচক (اَلْمُبَالَغَةُ) ইসম-এর ওজনে গঠিত। এটি মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম। কেননা তিনি তাঁর বান্দার প্রতি নিআমত দান করে থাকেন। তাই আল্লাহ্ দাতা ও অধিক দাতা। কাজেই যা কিছু সন্তান-সন্ততি বা অন্যদের উদ্দেশ্যে দান করা হয় তাকে مَوْهُوْبٌ বলা হয়।[৫]

ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, "কোনো বিনিময় ছাড়া কোনো কিছুর মালিকানা অন্যের কাছে হস্তান্তর করাই হিবা।"[৬] যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 'আমি তাকে ইসহাককে দান করলাম'।[৭] মহান আল্লাহকে وَاهِبٌ ও وَهَّابٌ বলে গুণান্বিত করা হয়। কেননা তিনিই কেবল জানেন কোথায় কিভাবে দান করতে হয়।[৮]

ইবন আবেদীন আশ্-শামী র. বলেন, "হিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্যের উপর অনুগ্রহ করা, যদিও তা সম্পদ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হয়ে থাকে। পরিভাষায় হিবা বলা হয় বিনামূল্যে অথবা বিনা প্রতিদানে কাউকে কোনো কিছুর মালিক বানানো এবং এ ব্যাপারে কোনো শর্তারোপ না করা।"[৯]

---

৩. ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস্-সিহাহ্*, বৈরূত : দারুল-ফিক্র, ১৪১৮/১৯৯৮, খ. ১, পৃ. ২৩২; লুইস মা'লূফ বলেন,.وَهَبَ يَهَبُ وَهْبًا" وَهَبَ يَهَبُ وَهْبًا لَمَال فُلاَنًا لِفُلَان : أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِلاَعِوَض অর্থ সম্পদ কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করা। অর্থাৎ প্রতিদান ছাড়া কাউকে কোনো বস্তু দান করাই হিবা। লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ্*, বৈরূতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৮৯, পৃ. ৯২০; ড. ইবরাহীম আনীস বলেন,.هِبَةٌ : أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِلاَعِوَض، فَهُوَ وَاهِبٌ وَوَهُوْبٌ، وَوَهَّابٌ وَوَهَّابَةٌ বিনিময় ছাড়া বিশেষ কোনো দানকে হিবা বলে। যিনি দান করেন তাকে وَهَّابٌ ،وَهُوْبٌ ،وَاهِبٌ ও وَهَّابَةٌ বলা হয়। ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসায়নিয়্যাহ্, তা. বি., পৃ. ১০৫৯

৪. *আল-কামূস আল-ফিক্হী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

৫. ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত : মুআস্সাসাতুত্-তারীখিল আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩, খ. ১৫, পৃ. ৪১১

৬. ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, মিসর : আল-মাতবা'আতুল মায়মানিয়্যাহ্. তা. বি., পৃ. ৫৪৯ اَلْهِبَةُ أَنْ تَجْعَلَ مِلْكَكَ لِغَيْرِكَ بِغَيْرِ عِوَض

৭. আল-কুরআন, ৬ : ৮৪. ২১ : ৭২, ২৯ : ২৭

৮. প্রাগুক্ত

৯. ইবন আবেদীন আশ্-শামী, *রাদ্দুল মুহ্তার*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৩৮৬/১৯৬৬ , খ. ২, পৃ. ৬৮৭; আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৭/১৯৯৬, খ. ৩, পৃ. ২৪৬

যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী, فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا "অতঃপর আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একজন অভিভাবক দান করুন।"[১০]

মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্‌সান বলেন, "আল-হিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ দান করা, উপঢৌকন দেয়া, যার দ্বারা দানগ্রহণকারী ব্যক্তি উপকৃত হয়। পরিভাষায় বিনিময় ছাড়া কাউকে কোনো কিছুর মালিক বানিয়ে দেয়া। যিনি দান করেন তাকে ওয়াহিব, দানকৃত সম্পদকে মাউহূব ও যিনি দান গ্রহণ করেন তাকে আল-মাউহূব লাহূ বলা হয়।"[১১]

ড. ওয়াহ্‌বাতুয্‌-যুহায়লী বলেন, "আল-হিবা এমন একটি বন্ধনের নাম যার দ্বারা কেউ বিনা প্রতিদানে অন্যকে কোনো কিছুর মালিক বানিয়ে দেয় অথচ তা তার জন্য আবশ্যক ছিলো না।"[১২]

T. P. Huges বলেন, "The term hibah in the language of Muslim law means a transfer of property made immediately and without exchange."[১৩]

পারিভাষিক সংজ্ঞায় চার মাযহাবের কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। তাঁদের মতামত নিম্নরূপ

এক. হানাফীগণের মতে, "জীবদ্দশায় প্রতিদানের শর্ত করা ছাড়া কাউকে কোনো কিছুর মালিক বানানোকে হিবা বলে।"[১৪]

দুই. মালিকীগণের মতে "প্রতিদান ছাড়া গ্রহীতার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোনো কিছুর মালিক বানানোকে হিবা বলে। এটাকে হাদীয়া নামেও অভিহিত করা হয়।"[১৫]

اَلْهِبَةُ لُغَةً اَلتَّفَضُّلُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَوْغَيْرَ مَالٍ، وَشَرْعًا تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ مَجَّانًا أَيْ بِلاَعِوَضٍ لاَ أَنْ عَدَمَ الْعِوَضِ شُرِطَ فِيْهِ.

১০. আল-কুরআন, ১৯ : ৫

১১. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্‌সান, *কাওয়াইদুল ফিক্‌হ*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮১/১৯৬১, পৃ. ৫৫০
اَلْهِبَةُ فِيْ اللُّغَةِ اَلتَّبَرُّعُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَوْهُوبُ وَفِيْ الشَّرْعِ تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ بِلاَعِوَضٍ وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ وَاهِبٌ وَلِذَالِكَ الْمَالُ مَوْهُوْبٌ وَلِمَنْ قَبِلَهُ الْمَوْهُوْبُ لَهُ

১২. ড. ওয়াহ্‌বাতুয্‌-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৮/১৯৯৭, খ. ৫, পৃ. ৩৯৮০. اَلْهِبَةُ عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكُ بِلاَ عِوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا.

১৩. T. P. Hughes, *Dictionary of Islam,* Delhi : Rupa & Co., 4th edition, 1999, p. 140.

১৪. *কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬ اَلْهِبَةُ تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ بِلاَ شَرْطِ الْعِوَضِ فِيْ الْحَالِ.

১৫. প্রাগুক্ত. اَلْهِبَةُ تَمْلِيْكُ لِذَاتِ بِلاَ عِوَضٍ لِوَجْهِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ وَجَدُّهُ وَتُسَمَّى هَدِيَّةً.

তিন. শাফিঈগণের মতে, "হিবা 'আম ও খাছ দু'ভাবে অর্থ প্রদান করে, (ক) হিবা হাদিয়া ও সাদাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (খ) কেবল হিবার সাথেই সংশ্লিষ্ট"।[১৬]

চার. হাম্বলীগণের মতে, "বৈধ পন্থায় কাউকে দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পদের অধিকারী বানানোকে হিবা বলে। দানকারীর কাছে যে সম্পদ বর্তমান থাকে তা আবশ্যক মনে না করে তার জীবদ্দশায় প্রতিদান ছাড়া দান করার নামান্তর হিবা।"[১৭]

হিবা শব্দটি হাদিয়া ও সাদাকা উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা হিবা, সাদাকা, হাদিয়া ও আতিয়্যা এগুলোর অর্থ প্রায় কাছাকাছি।[১৮] যদি মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে কেবল আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায় দান করা হয় তখন তাকে সাদাকা বলে। আর যদি কাউকে সম্মান বা কারো ভালবাসা পাওয়া অথবা আনুকূল্য লাভের আশায় কোনো কিছু উপহার প্রদান করা হয় তখন তাকে হাদিয়া বলে। এ ছাড়া যা কাউকে দান করা হয় তাই হিবা।

হিবার প্রচলন

সমাজের প্রতি কল্যাণ বিবেচনা করে হিবার প্রচলন করা হয়েছে। তাই হিবা করা মুস্তাহাব।[১৯] মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্টচিত্তে তারা মাহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।"[২০]

---

১৬. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৭ ألف: عَامٌّ يَتَنَاوَلُ الْهَدِيَةَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ. ب: خَاص بِالْهِبَةِ.

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮ اَلْهِبَةُ تَمْلِيكُ جَائِزٌ التصرف مَالاً مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولاً، لاَ تُعْذَرُ عَمَلُهُ مَوْجُوداً مُقَدَّراً عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِيْ هذِهِ الْحَيَاةِ بِلاَ عِوَضٍ.

১৮. ইব্‌ন কুদামা বলেন, وَجُمْلَةُ ذَالِكَ أَنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالْهَدِيَّةَ وَالْعَطِيَّةَ مَعَانِيْهَا مُتَقَارِبَةٌ وكُلُّهَا تَمْلِيكٌ فِيْ الْحَيَاةِ بغَيْرِ عِوَضٍ وَإِسْمُ الْعَطِيَّةِ شَامِلٌ لِجَمِيْعِهَا. আল-*মুগনী*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৭/১৯৯৭, খ. ৬ পৃ. ২৭৩

১৯. আব্দুর রহমান আল-জায়ায়িরী বলেন, فَالْهِبَةُ مَنْدُوبَةٌ *কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪; আস্-সাইয়্যেদ সাবিক বলেন, وَقَدْ شَرَعَ اللهُ الْهِبَةَ لِمَا فِيْهَا مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ وَتَوْثِيقِ عُرَى الْمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ. "আত্মার ভালোবাসা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় করার নিমিত্তে আল্লাহ্ হিবার প্রচলন করেছেন।" *ফিকহুস্-সুন্নাহ্*, শিরকাতুল মানার আদ্-দাওলিয়্যাহ্, ১৪১৬/১৯৯৫, খ. ৩, পৃ. ৪৩১

২০. আল-কুরআন, ৪ : ৪

আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীকে মাহ্র ফেরত প্রদান করে, তবে তা স্বামীর জন্য গ্রহণ করা বৈধ। আর এটিই হিবা। কেননা হিবার জন্য মনের সন্তুষ্টি প্রয়োজন।[২১] এ প্রসঙ্গে কাতাদা র. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا-আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রী স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার জবরদস্তি ছাড়া তাদের মহ্র হতে যে অংশ তোমাকে প্রদান করবে, আল্লাহ্ তোমার জন্য তা হালাল করেছেন, সুতরাং তুমি তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতাংশে নারীদের অভিভাবকদের প্রতি সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের প্রতি স্ত্রীদের মাহ্র নির্ধারণ করে বিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তারা যদি তা হতে তোমাদেরকে প্রদান করে, তবে তোমরা তা স্বানন্দে ভোগ করো।"[২২]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

"এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীনগণ, অভাবগ্রস্ত, পথিক, সাহায্য প্রার্থিদেরকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে....।"[২৩] এ আয়াতে আল্লাহ্র বাণী, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ এর মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি কৃপণতা পরিহার করে স্বীয় ধন-সম্পদ একমাত্র আল্লাহ্র ভালবাসায় দান করে। যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ-এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহর পথে দান খায়রাত করা এমন অবস্থায় যে, সে কৃপণ, বিলাসী জীবন যাপনের আকাঙ্খী এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত।

আবূ হামযা র. বলেছেন, আমি শা'বী র.-কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ মালের যাকাত আদায় করে তখন তাই কি তার মাল পবিত্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট? জবাবে তিনি এ আয়াত لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ থেকে

---

২১. ইমাম আস্-সারাখসী র. বলেন, وَإِبَاحَةُ الْأَكْلِ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ دَلِيلُ جَوَازِ الْهِبَةِ. *আল-মাবসূত,* বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৪১৪ /১৯৯৩, খ. ১২, পৃ. ৪৮.

২২. মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরুত্-তাবারী,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪২০/১৯৯২, খ. ৩, পৃ. ৫৮৫

عن قتادة: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا"، يقول: ما طابت به نفسًا في غير كَرْه أو هوان، فقد أحلّ الله لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا. وقال آخرون: بل عنى بهذا القول أولياء النساء، فقيل لهم: إن طابت أنفس النساء اللواتي إليكم عصمة نكاحهن، بصدقاتهن نفسًا، فكلوه هنيئًا مريئًا.

২৩. আল-কুরআন : ২ : ১৭৭

নিয়ে وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শোনালেন। তারপর বলেন, আমাকে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স রা. বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে সত্তর মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমের রা. ফাতিমা বিন্‌ত কায়স রা. থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই মালের মধ্যে যাকাত ব্যতীত আরো হক বা অধিকার রয়েছে।[২৪]

আলোচ্য আয়াতেও উল্লিখিত শ্রেণির মধ্যে যে দান করার কথা বলা হয়েছে তা আবশ্যিক নয়, বরং তা দ্বারা সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা উদ্দেশ্য। আর হিবার উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং উপরোক্ত আয়াত থেকে হিবার প্রচলন হয়েছে বলে মুফাস্‌সিরগণ মনে করেন। আবূ হুরায়রাহ্ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "তোমরা পরস্পর একে অপরকে হাদিয়া দিবে, এতে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।"[২৫]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রসূলুল্লাহ্ স. আমাদের মাঝে হাদিয়া ও উপঢৌকন দেয়ার প্রচলন করতে উৎসাহিত করেছেন। কেননা এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং মনের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, "হিবা করার পর যে ফিরিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করে এবং তা পুনরায় খায়।"[২৬] এ হাদীসে হিবা করে তা ফেরত নেয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা হিবার বাস্তবায়ন দেখতে পাই। তিনি হিবা গ্রহণ করেছেন এবং হিবা প্রদানও করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর উম্মতকে

---

২৪. *তাফসীরুত্-তাবারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ, ১০১

২৫. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ : কুবূলুল হাদীয়্যাহ্, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ্, তা. বি., পৃ. ১৫৫; বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ*, ইউ. পি. : আশরাফ বুক ডিপো, তা. বি., ২৮৩ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا

২৬. মূল আরবী, الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : হিবাতুর-রাজুলি লি ইমরাআতিহী ওয়াল মারআতি লি জাওযিহা, রিয়াদ : দারুস্-সালাম, ১৪১৯ /১৯৯৯, পৃ. ৪১৯; হাদীস নং ২৫৮৯, ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, তাহরিমুর-রুজু' ফিস্-সাদাকাতি ওয়াল-হিবা, বৈরূত : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১৪২৩/২০০২, পৃ. ৭০৪; হাদীস নং ১৬২২, ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, আর-রুজু' ফিল-হিবা, দিমাশক : মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১৪২৪/২০০৪, হাদীস নং ৩০৭১, ইমাম নাসাঈ', *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ: রুজু'ইল ওয়ালাদি ফীমা ই'উতা ওয়ালাদুহু, দিমাশক : মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১৪২৪/২০০৪, পৃ. ৯৮৫; হাদীস নং ৩৬৯৩, ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্, আস-সুনান, আর-রুজু' ফিল-হিবা, দিমাশক : মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১৪২৪/২০০৪, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং ২৩৮৭

হিবা গ্রহণ ও প্রদানে উৎসাহিত করেছেন।[২৭] এ প্রসঙ্গে আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার দ্বারা উপকারও লাভ করতেন।"[২৮]

রসূলুল্লাহ্ স. হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন যদিও তা পরিমাণে সামান্য হয়।[২৯] কোনো হাদিয়া গ্রহণে রসূলুল্লাহ্ স.-এর মধ্যে থেকে কখনো অনাগ্রহ দেখা যায়নি। আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "যদি কেউ আমাকে পশুর একটি ক্ষুরও উপহার দেয় আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করবো এবং যদি কেউ আমাকে পশুর ক্ষুরের দাওয়াত দেয় আমি সে দাওয়াতও গ্রহণ করবো।"[৩০]

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন : "আমাকে যদি ক্ষুর ও হাতের সামান্য গোশতের দিকেও ডাকা হয়, তবুও আমি যাবো এবং যদি ক্ষুর বা হাতের সামান্য গোশত উপহার পাঠানো হয় তাও গ্রহণ করবো।"[৩১]

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "তোমরা পরস্পর উপঢৌকন প্রদান করো, কেননা তাতে মনের হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।"[৩২] রসূলুল্লাহ্ স. কাফিরদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। যেমন পারস্যের বাদশাহ্ কিসরা, রোমান সম্রাট কায়সার-এর হাদিয়া তিনি গ্রহণ করেছেন।[৩৩]

---

[২৭] আস্-সাইয়্যেদ সাবিক বলেন, وكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ إِلَى قَبُوْلِهَا وَيَرْغَبُ فِيْهَا. "নবী স. হিবা গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন এবং হিবা করতে উৎসাহিত করেছেন।" *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

[২৮] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : আল-মাকাফা'আতি ফিল-হিবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮, হাদীস নং ২৫৮৫
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا

[২৯] *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

[৩০] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা যাআ ফী কুবূলিল হাদিয়্যাতি ওয়া ইজাবাতিদ দা'ওয়াহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪১৯/১৯৯৯, পৃ. ৩৯৮, হাদীস নং ১৩৩৮
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ

[৩১] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : মান আযাবা ইলা কুরাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৫, হাদীস নং ৫১৭৮
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

[৩২] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল ওয়ালা-ই ওয়াল হিবাহ্, অনুচ্ছেদ : ফী হাছছিন নাবিয়্যি স. আলাত তাহাদী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৩০, تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

[৩৩] ফিক্হুস্-সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

প্রার্থনা ছাড়া যদি এক ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে কিছু আর্থিক লেনদেন করে, তবে অপরের জন্য তা গ্রহণ করা উচিত, প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কেননা এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্ক, যা তিনি তাকে এ প্রক্রিয়ায় প্রদান করেছেন। হিবার বৈধতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[৩৪] যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا "আর যখন তোমাদেরকে কেউ অভিবাদন জানায় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন জানাবে অথবা তার অনুরূপ করবে।"[৩৫]

আয়াতে تَحِيَّةٌ দ্বারা اَلْعَطِيَّةُ বা উপঢৌকন উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, اَلسَّلَامُ উদ্দেশ্য। আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ উপঢৌকন দিলে তাকে সমপরিমাণ বা তার চেয়ে উত্তম উপঢৌকন দেয়া কর্তব্য।[৩৬] অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى "সৎকর্ম ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে।"[৩৭]

এ আয়াতে নিকটবর্তীগণের প্রতি অনুগ্রহ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। পারস্পরিক ভালো ও পুণ্যের কাজে উৎসাহিত করা এবং তা বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। হিবার দ্বারা পারস্পরিক উপকৃত হওয়া যায় এবং সওয়াব ও পুণ্য অর্জিত হয়।

মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ "এবং আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ছা করো এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে।"[৩৮] এখানেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আত্মীয়দের মাঝে হাদিয়া আদান-প্রদান করলে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্কে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, তাই হিবা ও উপঢৌকন প্রদান করে সম্পর্ক দৃঢ় করা জরুরী।

রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "যে ব্যক্তি তার রিয্কে প্রাচুর্য কামনা করে এবং তার আয়ু দীর্ঘ করতে চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।"[৩৯] بَسْطُ الرِّزْقِ দ্বারা উদ্দেশ্য

---

৩৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২২/২০০১, খ. ৬, পৃ. ২৩৭; ইবন কুদামা, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৪

৩৫. আল-কুরআন, ৪: ৮৬

৩৬. *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৭-৪৮; *বাদাই'উস্-সানাই',* তা.বি., খ. ৫, পৃ. ১৮৩

৩৭. আল-কুরআন, ৫ : ২

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ১

৩৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মান বাসাতা লাহু বির্-রিযক ওয়া সিলাতুর রিহ্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৮; হাদীস নং ৫৯৮৭, ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায় : আল-বিরর ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : সিলাতুর রিহম ওয়া তাহরীম কাতি'আতিহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩, হাদীস নং ২৫৫৭/২১

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

হলো রিয্কের মধ্যে প্রশস্ততা ও বরকত হওয়া। দীর্ঘ আয়ু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ যেন তার আয়ু বৃদ্ধি করেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন।

হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তারা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে, ফলে আয়ু ও রিয্ক বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিবা আমাদের জন্য ফরয বা ওয়াজিব পর্যায়ের কোনো বিষয় নয়, বরং তা মুস্তাহাব একটি কাজ, যা কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। এর দ্বারা সামাজিক ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় এবং পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

হিবার রুক্ন

হানাফী মাযহাব মতে, হিবার রুক্ন দু'টি, ইজাব ও কবুল। এ প্রসঙ্গে আল-কাসানী র. বলেন, "হিবার রুক্ন হলো দাতার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা এবং গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে তা কবূল করা।"[৪০] অবশ্য অন্য ফকীহগণ হিবার রুকন সংখ্যা বেশী বলেছেন। কিন্তু হানাফী ফকীহগণের মতই এক্ষেত্রে বেশী যৌক্তিক। কারণ ইজাব কবুলের বাইরে যেগুলোকে রুকন বলা হয়েছে মূলত এগুলো ইজাব কবুলের অন্তর্ভুক্ত।[৪১]

এক. ইজাব বা প্রস্তাব করা। যেমন وَهَبْتُ অর্থাৎ দাতা কর্তৃক এ কথা বলা যে, 'আমি তোমাকে হিবা করলাম'।

দুই. কবূল বা গ্রহণ। যেমন قَبِلْتُ অর্থাৎ গ্রহীতা কর্তৃক এ কথা বলা যে, আমি তা গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ যার জন্য হিবা করা হয়েছে হিবাকৃত মালে তখনই তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে, যদি সে এ হিবা কবূল করে নেয়।[৪২]

ইজাব ও কবূল-এর প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, এটা একটা চুক্তি। আর যে কোনো চুক্তি ইজাব ও কবূল দ্বারা সংঘটিত হয়।[৪৩]

---

৪০. *বাদাই'উস্-সানাই'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬২

৪১. আব্দুর রহমান আল-জাযায়িরী র. বলেন, হিবার রুক্ন তিনটি : (১) দাতা-গ্রহীতা, (২) দানকৃত বস্তু এবং (৩) শব্দাবলি বা ইজাব ও কবূল। -*কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮; ড. ওয়াহ্বাহ আয-যুহায়লী বলেন, "জমহুর আলিমগণের নিকট হিবার রুক্ন চারটি : (১) দাতা, (২) গ্রহীতা, (৩) দানকৃত বস্তু এবং (৪) শব্দাবলি বা ইজাব ও কবূল।-*আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯৮৩

৪২. *আল-বাহরুর রাইক*, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ৪১২; ইবনুল আবেদীন আশ্-শামী বলেন, رُكْنُهَا هُوَ الإِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ "হিবার রুক্ন হলো ইজাব ও কবূল।" *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৪৩. ড. ওয়াহ্বাতুয্-যুহায়লী বলেন, إِنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرِّعِ كَالإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ لَكِنْ لاَ يَمْلِكُهُ الْمَوْهُوْبُ لَهُ إِلاَّ بِالْقَبُوْلِ وَالْقَبْضِ. "হিবা এক প্রকার অনুগ্রহের চুক্তি। সুতরাং তা গ্রহীতার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়। যেমন ওসিয়াত। গ্রহীতা যদি হিবাকে কবূল না

বিক্রয়ের উপর কিয়াস করে ইমাম মালিক র. বলেন, হিবাকৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বেই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। সাদাকা সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

আমাদের দলীল এই, নবী স. বলেছেন, "হিবাকৃত বস্তু (হিবা গ্রহীতার) হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত হিবা বৈধ হয় না।"[88]

'বৈধ হবে না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'মালিকানা সাব্যস্ত হবে না'। এ কারণে যে, হিবা হলো দানমূলক চুক্তি। আর হস্তগত হওয়ার পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, দানকারীর উপর একটি বিষয় 'অবশ্য আরোপ' করা, যা সে দান করেনি। আর তা হলো অর্পণ করা। সুতরাং তা সিদ্ধ হবে না। ওসিয়াতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ওসিয়াতের ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সময় হলো মৃত্যুর পরে। যেহেতু মৃত্যুর কারণে বাধ্যবাধকতা গ্রহণের যোগ্যতা নেই, সেহেতু দানকারীর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রশ্ন নেই। আর ওয়ারিসের হক ওসিয়াত থেকে বিলম্বিত হয়। সুতরাং ওয়ারিস তার মালিকানা লাভ করে না।[8৫]

আবূ বকর আস-সিদ্দীক রা. তাঁর কন্যা আয়িশা রা.-এর অনুকূলে বিশ ওয়াসাক খেজুর হিবা করেন, যা তখনও গাছে ছিলো। তা সংগৃহীত না হতেই আবূ বকর রা.-এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। তিনি আয়িশা রা.-কে বললেন, তুমি যদি খেজুরগুলো হস্তগত করে নিতে তা হলে ওটি তোমারই হতো। এখন তো ওয়ারিসী সূত্রে তা সকলের মধ্যে বণ্টন হবে।[8৬]

উমর রা.ও হিবা সম্পন্ন হওয়ার জন্য হিবা গ্রহীতার হস্তগত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। অনুরূপভাবে উমর ইব্ন আবদুল আযীয র. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে, হিবা পূর্ণতার জন্য হস্ত গত হওয়া শর্ত এবং হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।[8৭]

নাবালেগ সন্তানের অনুকূলে হিবা করলে অভিভাবককে তার ঘোষণা দিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সম্পত্তি হিবাকারী পিতা-মাতার করায়ত্ব থাকলে এটি নাবালেগের দখলিস্বত্ব গণ্য হবে।[8৮]

করে এবং তা হস্তগত না করে তবে সে তার মালিক হবে না। -*আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯৮৩

88. *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. 8৮ لاَ يَجُوزُ الهِبَةُ إلاَّ مَقْبُوضَةً মারফূ (مرفوع) হাদীস হিসাবে এর কোন ভিত্তি নেই। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যাঈফা ওয়া আল-মাওযূআহ ওয়া আছারুহাহু সায়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি, হাদীস নং-৩৬০

8৫. *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ. 8, পৃ. 8৭৫; *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮; *আল-বাহরুর রাইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. 8১২; আল-*মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭8-২৭৫

8৬. *ইমাম মুহাম্মাদ*, আল-*মুওয়াত্তা* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ৩০, হাদীস নং ৮০৯; *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. 8৯; আল-*মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৫

8৭. *নাসবুর রায়াহ্*, কিতাবুল হিবা, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২৩০

8৮. ইমাম মুহাম্মাদ, *আল-মুওয়াত্তা প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৮০৮-৮১১; সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৬৯৩

হিবার হুক্‌ম

হিবার হুক্‌ম হলো, যে ব্যক্তির অনুকূলে হিবা করা হলো হিবাকৃত মালে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তবে এ মালিকানা অপরিহার্য মালিকানা নয়। কাজেই হিবাকারী ব্যক্তি হিবা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে হিবা দলীল বাতিলও করতে পারবে।[৪৯]

হিবার শর্তাবলি

হিবার শর্তসমূহের মধ্যে কতগুলো এমন যা কেবল রুক্‌ন-এর সাথে সম্পর্কিত, কতগুলো এমন যা হিবাকারীর সাথে সম্পর্কিত, আবার কতগুলো এমন যা হিবাকৃত মালের সাথে সম্পর্কিত।[৫০]

(১) রুকন সাথে সম্পর্কিত শর্ত হলো, হিবাকে এমন কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না করা যার হওয়া না হওয়া অনিশ্চিত। যেমন কেউ বললো, আমি অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তিকে হিবা করলাম, যদি অমুক ব্যক্তি আগমন করে। এভাবে হিবা করা জায়েয নয়।[৫১]

(২) হিবাকারী ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্ত হলো, হিবাকারীকে অবশ্যই হিবা করার উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তাকে স্বাধীন, বুদ্ধিমান, বালিগ এবং হিবাকৃত মালের মালিক হতে হবে। পক্ষান্তরে হিবাকারী যদি গোলাম, নাবালক বা পাগল হয়, তবে হিবা বিশুদ্ধ হবে না।[৫২] এমনিভাবে যে ব্যক্তি হিবাকৃত মালের মালিক নয় তার হিবাও শুদ্ধ হবে না।[৫৩]

---

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৩৯৮

৫০. *কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; *ফিক্‌হুস্‌-সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৩; *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮৭

৫১. *কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; *ফিক্‌হুস্‌-সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

৫২. ইব্‌ন আবেদীন আশ্‌-শামী র. বলেন

وشرائط صحتها فِيْ الْوَاهِبِ الْعقلُ وَالْبُلُوْغُ وَالْملْكُ فَلاَ تَصِحُّ هِبَةُ صَغِيْرٍ وَرَقِيْقٍ وَلَوْ , مكَاتِبًا.

রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭

৫৩. *কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০; *ফিক্‌হুস্‌-সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩; *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; ড. ওয়াহ্‌বাতুয্‌-যুহায়লী বলেন, يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَاهِبُ لَهُ أَهَلِيَّةَ اَلتَّبَرُّعِ بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ مَعَ الرُّشْدِ وَهذَا شَرْطُ انْعِقَادِ، لأَنَّ الْهِبَةَ تَبَرُّعٌ فَلاَ تَجُوْزُ هِبَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ.

আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮৭

(৩) হিবাকৃত বস্তুর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি শর্ত রয়েছে :

(ক) যে বস্তু হিবা করা হবে তা হিবা করার সময় মজুদ থাকতে হবে। কাজেই যে মাল তখনও মজুদ নয় এ জাতীয় মাল হিবা করা জায়েয নয়। যেমন কেউ বললো, এ বছর আমার গাছে যে ফল আসবে অথবা আমার বকরী যে বাচ্চা দিবে তা আমি হিবা করলাম। এধরনের হিবা জায়েয নয়।[৫৪]

(খ) যে বস্তু হিবা করা হবে তা হালাল ও মূল্যবান বস্তু হওয়া আবশ্যক। কাজেই শূকর, মদ ও মৃত পশু হিবা করা জায়েয নয়।[৫৫]

(গ) যার অনুকূলে হিবা করা হবে, হিবাকৃত বস্তুটি তার হস্তগত হওয়া আবশ্যক। হিবাকৃত বস্তু হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা সাব্যস্ত হবে না এবং হিবাকারীর হিবাও পরিপূর্ণ হবে না।[৫৬]

(ঘ) যে বস্তু হিবা করা হবে তা যদি বন্টনযোগ্য হয়, তবে তা বন্টনকৃত হতে হবে। এমনিভাবে তা অন্য মালামাল থেকে আলাদা ও পৃথক হতে হবে। মিশ্রিত মাল হিবা করা জায়েয নয়।[৫৭]

(ঙ) সে বস্তু মালিকানাধীন বস্তু হতে হবে। মুবাহ্ বস্তু অর্থাৎ যে বস্তু ব্যবহারে অপরাপর লোকদেরও বৈধ অধিকার রয়েছে তা হিবা করা জায়েয নয়।[৫৮]

(চ) অনুরূপভাবে যে বস্তু হিবা করা হবে তা হিবাকারী ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তু হওয়া আবশ্যক। কাজেই অপরের মাল তার অনুমতি ব্যতিরেকে হিবা করা জায়েয নয়।[৫৯]

---

৫৪. *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৬৪; *রাদ্দুল মুহ্তার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭; *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮৯; আব্দুর রহমান আল-জাযায়েরী বলেন, أَنْ يَكُوْنَ مَوْجُوْداً وَقْتَ الْهِبَةِ، فَلاَ تَصِحُّ هِبَةُ مَالَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ وَقْتَ الْعَقْدِ. *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

৫৫. *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯০

৫৬. *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩; *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৫৭. *কিতাবুল ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩; ড. ওয়াহ্বাতুয্-যুহায়লী বলেন, لاَ تَجُوْزُ الْهِبَةُ فِيْ الْمَشَاعِ الَّذِيْ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ. *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯১

৫৮. কিতাবুল ফিক্হ *'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৩

৫৯. *কিতাবুল ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১; *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৮

হিবার প্রকারভেদ

হিবা দুই প্রকার।

এক. হিবায়ে তামলীক (هِبَةُ تَمْلِيْك) : হিবায়ে তামলীক হলো, কোনো প্রতিদান ছাড়াই অপর কাউকে নিজের মাল দান করা এবং তাকে এর মালিক বানিয়ে দেয়া।

দুই. হিবায়ে ইসকাত (هِبَةُ إِسْقَاطْ) : হিবায়ে ইসকাত হলো, কারো নিকট টাকা পাওনা থাকলে তাকে এর থেকে দায়মুক্ত করে দেয়া।[৬০]

ইব্‌ন রুশ্‌দ র.-এর মতে, হিবা দুই প্রকার। তা হলো :

এক. হিবাতু আইন (هِبَةُ عَيْن) : এটি এমন হিবা যার দ্বারা সওয়াব উদ্দেশ্য করা হয় এবং সওয়াব দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।

দুই. হিবাতু মুনফি'আহ্ (هِبَةُ مُنْفعَةْ) : এটি এমন হিবা যার উদ্দেশ্য হয় উপকার করা এবং এর দ্বারা সৃষ্টির সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।[৬১]

এছাড়াও হিবার আরো কিছু শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো :

আজীবনের জন্য হিবা (উমরা)

কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে তার জীবনকাল পর্যন্ত সময়ের জন্য কিছু হিবা করলে তা হিবা গ্রহীতারই হবে এবং হিবা গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা তার (হিবা গ্রহীতার) ওয়ারিসগণের প্রাপ্য হবে এবং জীবনকালের জন্য এ দান সীমিত থাকবে না। এ ধরনের হিবাকে পরিভাষায় উমরা বলে। এ প্রকার শর্তাধীনে হিবা করা হলে শর্তটি বাতিল গণ্য হয় এবং হিবা বলবৎ হয়। হিবা গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা তার (হিবা গ্রহীতার) ওয়ারিসগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং জীবনকালের শর্ত থাকা সত্ত্বেও দানকারী ওটির মালিক হতে পারে না।[৬২] হাদীসে বর্ণিত আছে, জাবির রা. বলেন, নবী স. বলেছেন : "কোনো ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব (উমরা) দেয়া হলে তা তার জন্য ও তার ওয়ারিসগণের জন্য। ওটি যাকে দেয়া হয়েছে তারই থাকবে, যে দান

---

[৬০] *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

[৬১] ইব্‌ন রুশ্‌দ আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৪২৫/২০০৪, খ. ৪, পৃ. ১১৫

وهبة العين القول في أنواع الهبات والهبة منها ما هي هبة عين، ومنها ما هي هبة منفعة.
منها ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها ما
به وجه المخلوق يقصد بها وجه الله، ومنها ما يقصد

[৬২] *বাহরুর রাইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৩; *ফিক্‌হুস্‌-সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১-৪৪২; *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮৪

করেছে তার হাতে ফিরে আসবে না। কারণ সে এমনভাবে একটি জিনিস দান করেছে যার উপর (গ্রহীতার) ওয়ারিসী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[৬৩]

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, জাবির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "তোমরা তোমাদের সম্পদ ধরে রাখো, তা নষ্ট করো না। কোনো ব্যক্তি জীবনস্বত্ব (উমরা) দান করলে, তা সে যাকে দান করেছে তা তার জীবনে ও মরণে এবং তার ওয়ারিসগণের।"[৬৪]

শর্তসাপেক্ষে রুকবা করা বৈধ

শর্তসাপেক্ষে 'রুকবা' করা বৈধ হবে এবং তা এরূপ যে, দান করার সময় গ্রহীতাকে দাতা বললো, এ জিনিস তুমি ভোগ করতে থাকো। যদি আমি তোমার পূর্বে মারা যাই, তবে তুমিই ওটির মালিক হবে। আর যদি তুমি আমার আগে মারা যাও, তবে ওটি আমারই থাকবে। এভাবে দান করা বৈধ নয়, তবে তা গ্রহীতার জন্য বলবৎ হবে।[৬৫]

শর্তসাপেক্ষে রুকবা বৈধ নয়, তবে যার অনুকূলে রুকবা করা হবে তা তারই হবে এবং মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ ওটির মালিক হবে। জাবির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "রুকবা যাকে দেয়া হয় তার জন্য তা বৈধ।"[৬৬]

ইব্‌ন উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "রুকবা বৈধ নয়। যার অনুকূলে রুকবা করা হয় তা তার জন্য তার জীবনে ও মরণে।"[৬৭]

---

[৬৩] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : আল-উমরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬, হাদীস নং ১৬২৫

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

[৬৪] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : উমরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭, হাদীস নং ১৬২৫

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ

[৬৫] *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩

[৬৬] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফির-রুকবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১, হাদীস নং ১৩৫১

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

[৬৭] ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-হিবাত, অনুচ্ছেদ : আর-রুকবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং ২৩৮২

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

যায়দ ইবনে ছাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "তোমরা রুকবা করো না। কারণ কেউ রুকবা করলে তা রুকবা গ্রহীতার অধিকারে চলে যায়।"[৬৮] আলিমগণের মতে সাধারণত রুকবা করা বৈধ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও মুহাম্মাদ র.-এর মতে বৈধ নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ র. জমহুরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা র. এ ধরনের দানকে এক প্রকারের ফেরতযোগ্য ঋণ (আরিয়াত) মনে করেন।[৬৯]

হিবা বিল-ইওয়ায

বিনিময় প্রদানের পরিবর্তে হিবা করা হলে তাকে 'হিবা বিল-ই'ওয়ায' বলে। বিনিময় প্রদানের পর তা কার্যকর হবে। হিবা বিল-ই'ওয়ায বিক্রয় চুক্তির অনুরূপ। অতএব ত্রুটি বা না দেখার অজুহাতে তা পরিত্যক্ত হতে পারে। এ ধরনের হিবা বৈধ ও কার্যকর হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত থাকা জরুরি : (ক) হিবা গ্রহণকারীকে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করতে হবে। (খ) হিবাকারীকে হিবাকৃত জিনিস অবিলম্বে হিবা গ্রহীতার মালিকানায় ন্যস্ত করতে হবে। প্রদত্ত বিনিময় কম বা বেশি যা হোক তা বিবেচনাযোগ্য নয়। বিনিময় প্রদান না করলে হিবাকারী তার দান ফিরিয়ে নিতে পারে।[৭০]

বিনিময় প্রদানের শর্তে হিবা

নির্দিষ্ট বিনিময় প্রদানের শর্ত যুক্ত করে হিবা করলে তাকে হিবা-বিশ-শারত বলে এবং সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণ হলে হিবা কার্যকর হয়। এ প্রকারটি হিবা বিল-ই'ওয়াযের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে দানগ্রহীতা কর্তৃক বিনিময় প্রদান স্বেচ্ছামূলক এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।[৭১]

ঘটনা সাপেক্ষে হিবা

সম্ভাব্য কোনো ঘটনা বা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে হিবা করা বৈধ নয়। কোনো দান সম্ভাব্য কোনো ঘটনার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এ ধরনের হিবা হিবা করা হয়নি বলে গণ্য হবে।[৭২]

---

৬৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : ফির-রুকবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০, হাদীস নং ৩৫৫৯

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ »

৬৯. শামসুল হক আযীমাবাদী, *আওনুল মা'বূদ ফী শারহি সুনানি আবী দাউদ*, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৫৫৫; *আল-হিদায়া*, অধ্যায় : আল-হিবা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৬

৭০. *কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩; *বাদাই'উস্-সানাই'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৭১. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫/১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৬৯৮-৬৯৯

৭২. প্রাগুক্ত

শর্তযুক্ত হিবা

যে ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত যুক্ত করে হিবা করা হয় যাতে দানের সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ন হয় সে ক্ষেত্রে হিবা এমনভাবে কার্যকর হয় যেন আদৌ কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি। হিবা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো শর্ত আরোপ করলে শর্তটি বাতিল হবে এবং হিবা বলবৎ হবে।[৭৩]

মরণব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় হিবা

মরণব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির হিবা করা বৈধ নয়, কিন্তু হিবাকৃত সম্পদ গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করলে সর্বাধিক এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে তা কার্যকর হবে এবং হস্তান্তরের পূর্বে দাতা মারা গেলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে। মৃত্যুশয্যায় হিবা করা জায়েয নয়। তবুও এ অবস্থায় কেউ হিবা করলে তার সর্বাধিক এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে তা কার্যকর হবে। কিন্তু গ্রহীতার নিকট হিবাকৃত সম্পদ হস্তান্তরের পূর্বে দাতা মারা গেলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে এবং দাতার ওয়ারিসগণই তার মালিক হবে।[৭৪]

ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ঋণ হিবা করা বৈধ ও পছন্দনীয়

ঋণগ্রহীতা দান গ্রহণ করার কথা বাচনিক ব্যক্ত না করলেও হিবা কার্যকর হবে, তবে তা প্রত্যাখ্যান করলে হিবা বাতিল হবে। তৃতীয় ব্যক্তিকে ঋণ হিবা করলে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের এবং হিবা গ্রহীতাকে তা আদায় করে দেয়ার নির্দেশ দিতে হবে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে।[৭৫] হাসান ইব্ন আলী রা. তার পাওনা টাকা একজনকে দান করেছিলেন।

অমুসলিমের অনুকূলে হিবা

কোনো মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তির (যিম্মী) অনুকূলে হিবা করতে পারে। হিবার বিধানের ক্ষেত্রে অমুসলিমরা মুসলমানগণের সমপর্যায়ভুক্ত।[৭৬] মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হতে উচ্ছেদ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"[৭৭]

---

[৭৩] *ফিক্হুস-সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪; সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯৬

[৭৪] প্রাগুক্ত

[৭৫]. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫

[৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮; আল-*মুগনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

[৭৭] আল-কুরআন, ৬০ : ৮

রসূলুল্লাহ্ স. উমর রা.-কে একটি রেশমী বস্ত্র দান করলে তিনি তা মক্কায় অবস্থানরত তার এক মুশরিক প্রতিবেশী (ভাই)-কে দান করেন।[৭৮]

মুসলিম ব্যক্তির অনুকূলে অমুসলিম ব্যক্তির হিবা

কোনো অমুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির অনুকূলে হিবা করলে তা গ্রহণ করা বৈধ। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের দান গ্রহণ করাও মুসলমানদের জন্য বৈধ। রসূলুল্লাহ্ স.-কে একটি (রান্না করা) বিষ মিশ্রিত বকরী (এক ইয়াহুদী নারী কর্তৃক) উপহার দেয়া হয়েছিল। আইলার অমুসলিম শাসক রসূলুল্লাহ্ স.-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন আর রসূলুল্লাহ্ স. তাকে একটি মূল্যবান চাদর উপহার দিয়েছিলেন।[৭৯]

দাতা-গ্রহিতার মতভেদে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা

কোনো ব্যক্তি হিবা করে সংশ্লিষ্ট বস্তুর মালিকানা অর্পণের পর তা অস্বীকার করলে, হিবাগ্রহিতা সাক্ষী উপস্থিত করে নিজের অনুকূলে হিবা প্রমাণ করতে পারে।[৮০] সাক্ষীগণ যদি বলে, দাতা সংশ্লিষ্ট জিনিস দাবিদারকে হিবা করেছিল এবং তার দখলও অর্পণ করেছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইব্ন জুদ'আনের আযাদকৃত দাস সুহাইবের সন্তানেরা দু'টি ঘর ও একটি কামরার অধিকার দাবি করে বললো, রসূলুল্লাহ্ স. ঐগুলো সুহাইবকে দান করেছিলেন। মারওয়ান (মদীনার গভর্নর) বলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো সাক্ষী আছে কি? তারা বললো, ইব্ন উমর রা. সাক্ষী আছেন। তিনি উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিলেন, রসূলুল্লাহ্ স. সুহাইবকে ঘর দু'টি ও একটি কামরা দান করেছেন। অতএব, তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে মারওয়ান তাদের অনুকূলে রায় প্রদান করলেন। তবে সাক্ষীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোহগ্য হবে না।[৮১]

হিবার শব্দাবলি

নিম্নের শব্দাবলি দ্বারা হিবা সংঘটিত হবে :

(১) وَهَبْتُ "আমি হিবা করলাম।" এটি হিবার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শব্দ।

(২) نَحَلْتُ "আমি দান করলাম।" এ শব্দটিও হিবার অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮২] কেননা রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "তোমার প্রত্যেক সন্তানকে কি অনুরূপ দান করেছ?"[৮৩]

---

[৭৮]. ইমাম আবু-দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী লুবসিল হারীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২, হাদীস নং ৪০৪০ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ

[৭৯]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : কবুলুল হাদিয়াতি মিনাল মুশরিকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

[৮০]. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

[৮১]. প্রাগুক্ত

[৮২]. *কিতাবুল ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; আল-*মুগনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

[৮৩]. আল-*মুগনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তা. বি., খ. ৯, পৃ. ২৪ أَكُلُّ أَوْلَادِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟

(৩) أَعْطَيْتُ "আমি দিলাম।" এ শব্দটিও রূপকভাবে হিবার অর্থ প্রদান করে। তাই أَعْطَاكَ اللهُ এবং وَهَبَكَ اللهُ বাক্য দু'টি একই অর্থে বলা হয়ে থাকে।

(৪) أَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَّعَامَ "তোমাকে এ খাবার খেতে দিলাম।" أَطْعَمْتُ শব্দটিকে যখন এমন বস্তুর সাথে যুক্ত করা হয়, যার বস্তুসত্তাটি ভক্ষণ করা যায়। যেমন খাদ্য দ্রব্য। তখন এ দ্বারা বস্তুসত্তাটির মালিকানা দান করাই উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি বলে اطعمتك هذه الأرض "এ জমি তোমাকে খেতে দিলাম" তখন তা দ্বারা ভাড়া প্রদান উদ্দেশ্য হবে। কেননা ভূমির বস্তুসত্তা ভক্ষণ করা যায় না। সুতরাং তা দ্বারা ভূমির ফসল ভক্ষণ করা উদ্দেশ্য হবে।[৮৪]

(৫) جَعَلْتُكَ هَذَا الثَّوْبُ لَكَ "এ কাপড়টি তোমার জন্য নির্ধারণ করলাম।" এ বাক্যে لَكَ-এর মধ্যে "লাম" অব্যয়টি মালিকানা সাব্যস্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।[৮৫]

(৬) أَعْمَرْتُكَ هَذَا الشَّيْءُ "এ বস্তুটি তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত তোমাকে দিলাম।" এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "কেউ যদি কারো উদ্দেশ্যে উমরা বলে তাহলে উমরাকৃত বস্তুটি উমরা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর সেটা তার ওয়ারিসদের হয়ে যাবে।[৮৬]

(৭) حَمَلْتُكَ عَلَى هَذِه الدَّابَّة "আমি তোমাকে এ বাহনের উপর সওয়ার করলাম।" حَمَلْتُكَ অর্থ বহন করলাম। কথাটির প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ আরোহণ করালাম। সুতরাং প্রত্যক্ষ অর্থ হিসেবে এটা হবে ভাড়া দেয়া। কিন্তু শব্দটি হিবার অর্থকেও সম্ভাবনারূপে ধারণ করে। যেমন বলা হয়, حَمَلَ الأَمِيْرُ فُلاَنًا عَلَى فَرَس "আমীর অমুককে একটি ঘোড়ায় বহন করিয়েছেন।" আর তা দ্বারা 'মালিক বানিয়েছেন' বুঝানো হয়। সুতরাং বক্তার নিয়তের সময় শব্দটিকে সেই অর্থেই প্রযুক্ত করা হবে।[৮৭]

(৮) كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبُ "তোমাকে এ বস্ত্রটি পরিধান করালাম। এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়। কেননা কসমের কাফ্ফারা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, أَوْ كِسْوَتُهُمْ "কিংবা তাদের বস্ত্র পরিধান করানো।"[৮৮]

---

৮৪. *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৪; *বাদাই'উস্-সানাই'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৮৫. আল-কাসানী র. বলেন, *বাদাই'উস্-সানাই'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

لِأَنَّ اللَّامَ الْمُضَافَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْمِلْكِ لِلتَّمْلِيكِ فَكَانَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ مَعْنَى الْهِبَةِ

৮৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : আল-উমরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬, হাদীস ১৬২৫ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

৮৭. আল-কাসানী, *বাদাই'উস্-সানাই'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪

৮৮. *বাহরুর রাইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৩; *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২; *কিতাবুল ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

যেসব বস্তু হিবা করা যায় এবং যেসব বস্তু হিবা করা যায় না

(১) যে কোনো বৈধ মাল হিবা করা জায়েয।

(২) যে সম্পত্তি ভাগ করা যায় না এবং ভাগ করা হলে তা আর ব্যবহারযোগ্য থাকে না, এ জাতীয় অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সম্পত্তি হিবা করা জায়েয। যেমন গোসলখানা, কূপ ইত্যাদি।

(৩) যে সম্পত্তি বণ্টনযোগ্য এবং বণ্টনের আগে পরে উভয় অবস্থাতেই তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, এ জাতীয় সম্পত্তি বণ্টন না করে হিবা করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। যে সম্পত্তি বন্টন করা যায় না এ জাতীয় অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সম্পত্তি হিবা করতে হলে শর্ত হলো, এর পরিমাণ জানা থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যদি পরিমাণ জানা না থাকে তাহলে হিবা জায়েয হবে না।[৮৯]

(৪) বণ্টনযোগ্য সম্পত্তি যদি বণ্টন না করেই দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নিকট হিবা করা হয়, তবে সাহেবাইনের মতে এ হিবা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে, এ হিবা ফাসিদ বলে গণ্য হবে, তবে বাতিল হবে না। কাজেই হিবা গ্রহীতাগণ নিজ নিজ অংশের দখল গ্রহণ করে নিলে তাদের মালিকানা এতে সাব্যস্ত হয়ে যাবে।[৯০]

(৫) দুই ব্যক্তি যদি তাদের মালিকানাধীন একটি বাড়ী অপর কোনো ব্যক্তিকে হিবা করে তবে তা জায়েয হবে।[৯১]

(৬) কোনো ব্যক্তি যদি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বা এর অধিক কিংবা সমস্ত সম্পত্তি কোনো ওয়ারিসের অনুকূলে বা অন্য কোনো ব্যক্তির অনুকূলে হিবা করে তবে তা আইনগত দিক থেকে বৈধ হলেও ন্যায়নীতির দিক থেকে এরূপ করা ভালো নয়।[৯২]

(৭) কেউ যদি কাউকে জমির ফসল বা গাছের ফল হিবা করে এবং তা কেটে নেয়ার জন্য বলে, অতঃপর যার অনুকূলে হিবা করা হয়েছে সে যদি তা কেটে নেয় তবে হিবা বিশুদ্ধ হবে।

(৮) একটি বাড়ী কারো নিকট ভাড়ায় দেয়া আছে। এমতাবস্থায় মালিক যদি এর কোনো একটির ঘর ভাড়াটিয়াকে হিবা করে দেয় তাহলে এ হিবা জায়েয হবে।

---

৮৯. *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৯১. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯; ইমাম শাফিঈ র. বলেন,

وَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَصِيْبَهُ فَقَبَضَ الْهِبَةَ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ

আল-উম্ম, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১০/১৯৯০, খ. ৭, পৃ. ১২১

৯২. *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

(৯) মৃত্যুশয্যায় হিবা করা জায়েয নয়। এ অবস্থায় কেউ হিবা করলে তা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের উপর কার্যকর হবে। কিন্তু গ্রহীতার নিকট হিবাকৃত সম্পদ হস্তান্তরের পূর্বে দাতা মারা গেলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে এবং দাতার ওয়ারিসগণই এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে।

(১০) ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ঋণ হিবা করা বৈধ ও প্রশংসনীয়। ঋণগ্রহীতা দান গ্রহণ করার কথা বাচনিকভাবে ব্যক্ত না করলেও হিবা কার্যকর হবে। অবশ্য ঋণগ্রহীতা প্রত্যাখ্যান করলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে ঋণ হিবা করলে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের এবং হিবাগ্রহীতাকে তা উসূল করে নেয়ার নির্দেশ দিতে হবে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে হিবা বাতিল হয়ে যাবে।[৯৩]

(১১) গমের ভেতরের আটা এবং তিলের ভেতরের তেল হিবা করলে তা ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

(১২) দুধের ভেতরের ঘি হিবা করলেও অনুরূপ হুক্‌ম প্রযোজ্য হবে।

(১৩) হিবাকৃত বস্তু যদি কারো নিকট অদীআত (আমানত) বা আরিয়াত (হাওলাত) হিসেবে থাকে, অতঃপর এ বস্তু যদি সে তাকে হিবা করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে এবং হিবার দ্বারাই সে এর মালিক হয়ে যাবে। নতুনভাবে ঐ মাল হস্তগত করে নেয়া জরুরি নয়।[৯৪]

হিবা প্রত্যাহারের বিধান

হিবা প্রত্যাহার করা বা রদ করা মাকরূহ্ হলেও তা আইনের দৃষ্টিতে বৈধ। হিবা চাই রক্ত সম্পর্কীয় মাহ্‌রাম আত্মীয়কে করা হোক বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে করা হোক বা মাহ্‌রাম নয় এমন কোনো রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে করা হোক অথবা রক্ত সম্পর্কীয় নয় এমন কোনো মাহ্‌রাম ব্যক্তিকে করা হোক। যদি এর দখলস্বত্ব অর্পণ না করা হয় তবে হিবাকারী ব্যক্তির জন্য তা প্রত্যাহার করে নেয়া জায়েয আছে। কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় কোনো মাহ্‌রাম আত্মীয়কে হিবা করে এর দখলস্বত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা আর জায়েয নয়। অবশ্য অন্যদের বেলায় এ অবস্থায় হিবা প্রত্যাহার করা জায়েয আছে। দখল হস্তান্তর করার পূর্বে হিবাকারী এককভাবেই তা রদ করতে পারে। কিন্তু দখলস্বত্ব হস্তান্তরের পর হিবা প্রত্যাহারকরণ পূর্ণ হওয়ার জন্য হিবাকারী হিবা প্রত্যাহারকরণের সাথে আদালতের ফয়সালা অথবা হিবাগ্রহীতার সম্মতি আবশ্যক। হিবাকারী ব্যক্তি যদি তার হিবা আংশিকভাবে প্রত্যাহার করতে চায়, তবে তাও জায়েয আছে।[৯৫]

---

৯৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯; *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৬৫

৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০; *কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলা মাযাহিবিল 'আরবা'আ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

৯৫. প্রাগুক্ত

হিবা প্রত্যাহার করা বৈধ হলেও হাদীসের দৃষ্টিতে তা একটি ঘৃণিত কাজ। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ স. থেকে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। যেগুলো হিবা প্রত্যাহারে নিরুৎসাহিত করেছে। যেমন :

১. ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি হিবা করে তা আবার ফেরত নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মত যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে।"[৯৬]

ইমাম আবূ জা'ফর আত্-তাহাভী র. বলেন, আলিমগণের একটি দল এ মত পোষণ করেন যে, হিবকারীর জন্য তার হিবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। তারা উল্লিখিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। তাঁরা বলেন, "রসূলুল্লাহ্ স. যখন হিবা করে ফিরিয়ে নেয়াকে বমি করে তা ফিরিয়ে নেয়ার সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন অথচ বমি করে তা পুনরায় (মুখের মধ্যে) ফিরিয়ে নেয়া তার জন্য হারাম। সুতরাং হিবা করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নেয়াও হারাম হবে।

অপরপক্ষে 'আলিমগণের অপর একটি দল এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, হিবাকারীর জন্য তার হিবাকৃত মাল পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া জায়েয আছে। (১) যদি তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, (২) যদি তা নষ্ট করে ফেলা না হয়ে থাকে, (৩) যদি তার মধ্যে কোনো বৃদ্ধি না করা হয়ে থাকে, (৪) যাকে হিবা করা হয়েছে সে তার কোনো 'মাহরাম' ও (রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয়) নয়, (৫) হিবা করার পর সে কোনো বিনিময়ও গ্রহণ করেনি। যাকে হিবা করা হয়েছে সে যদি হিবাকারীকে কোনো বিনিময় দান করে থাকে এবং হিবাকারী বিনিময় গ্রহণ করে থাকে অথবা যাকে হিবা করা হয়েছে সে যদি হিবাকারীর কোনো 'মাহ্রাম, হয়ে থাকে, তবে হিবাকারীর জন্য তার হিবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া জায়েয হবে না। আর যদি হিবাকারী হিবাকৃত ব্যক্তির 'মাহরাম' না হয়, তবে কোনো মহিলা তার স্বামীকে কিংবা স্বামী তার স্ত্রীকে হিবা করলে তারা দু'জনই এ ক্ষেত্রে 'মাহ্রাম'-এর মতই। তাদের কারো পক্ষেই ঐ মাল ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়, যা সে তার সাথীকে হিবা করেছে। আর এ ব্যাপারে তাঁদের দলীল হলো, "হিবা করার পর যে ব্যক্তি পুনরায় তা ফিরিয়ে নেয় রসূলুল্লাহ্ স. তাকে তার সমতুল্য করেছেন, যে বমি করার পর তা পুনরায় মুখে ফিরিয়ে নেয়। তবে তিনি একথা স্পষ্ট করেননি যে, সে কে, যে তার বমি ফিরিয়ে নেয়? এখানে এ সম্ভাবনা আছে যে, সে হলো ঐ

---

[৯৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াহিল্লু লি আহাদিন আন ইয়ারজি'আ ফী হিবাতিহি ওয়া সাদাকাতিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪; হাদীস নং ২৬২১, ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়ঃ আল-হিবা, অনুচ্ছেদঃ তাহরিমুর-রুজু' ফিস্-সাদাকাতি ওয়াল-হিবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪, হাদীস নং ১৬২২/৭

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

মানুষটি, যে তার নিজের বমি পুনরায় মুখে ফিরিয়ে নেয়। সে ক্ষেত্রে তিনি হিবার মাল যে ব্যক্তি ফিরিয়ে নিল তাকে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য সাব্যস্ত করলেন, যে ব্যক্তি হারাম বস্তু ফিরিয়ে নিলো। অতএব, এ হাদীস দ্বারা যারা প্রথম বক্তব্য পেশ করেছেন, তাদের মত প্রমাণিত হলো। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন, তিনি কুকুরকেই উদ্দেশ্য করেছেন, যে কুকুর বমি করে তার বমি পুনরায় মুখে ফিরিয়ে নেয় অথচ কুকুর তো আর হারাম-হালালের মুকাল্লাফ নয়।

অতএব হাদীসের অর্থ হবে, যে ব্যক্তি হিবা করার পর পুনরায় তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঘৃণিত বস্তু ফিরিয়ে নেয়। আর এটা ঐ ঘৃণিত বস্তুর মতই ঘৃণিত, যা কুকুর তার মুখে ফিরিয়ে নেয়। অতএব এ অর্থের প্রেক্ষিতে হিবাকারীর জন্য তার হিবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হবে না।[৯৭]

(২) ইব্ন আব্বাস র. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। কাজেই যে ব্যক্তি হিবা করে তা ফেরত নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা গলাধকরণ করে।"[৯৮]

(৩) আমর ইব্ন শু'আয়ব বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "তোমাদের কেউ যেন হিবা করে তা ফেরত না নেয়। তবে পিতা তার পুত্র থেকে প্রদত্ত হিবা ফেরত নিতে পারবে।"[৯৯]

(৪) ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন উমর রা. নবী স. সূত্রে বলেন, "কাউকে কিছু হিবা করে তা ফেরত নেয়া জায়েয নেই। কিন্তু পিতা তার পুত্রকে হিবা করে তা ফেরত নিতে পারে।"[১০০]

---

৯৭. ইমাম আবু জাফর আত্-তাহাভী, *শারহু মা'আনিউল আছার,* অধ্যায় : আল-হিবা ওয়াস্-সাদাকাহ্, অনুচ্ছেদ : রুজু ফিল-হিবাহ্, পাকিস্তান : সামাদ কোম্পানী, ১৩৯০/১৯৭০, খ. ২, পৃ. ২৬৪

৯৮. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াহিল্লু লি আহাদিন আন ইয়ারজি'উ ফী হিবাতিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪, হাদীস নং ২৬২২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

৯৯. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান,* অধ্যায়: আল-হিবাহ্, অনুচ্ছেদ: রুজু'ইল ওয়ালিদি ফীমা ই'উতা ওয়ালাদুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৪; হাদীস নং ৩৬৯১, *ইমাম ইব্ন মাজাহ্,* আস-সুনান, অধ্যায় : আল-হিবাত, অনুচ্ছেদ : মান আ'তা ওয়ালাদা ছুম্মা রাজা'আ ফীহি, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৩১, হাদীস নং ২৩৭৮

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

১০০. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-হিবাহ্, অনুচ্ছেদ : রুজু'ইল ওয়ালিদি ফীমা ই'উতা ওয়ালাদুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৪-৯৮৫, হাদীস নং ৩৬৯২

'হিবাকারীর জন্য হিবার মাল পুনঃগ্রহণ করা হালাল নয়' এ কথা বলার পর রসূলুল্লাহ্ স. পিতা সন্তানকে হিবা করার পর তার থেকে পুনঃগ্রহণ করার বিষয়টি এ হুকুম থেকে বাদ দিয়েছেন। আমাদের মতে এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, পিতা পুত্রকে হিবা করার পর পিতার প্রয়োজনকালে তার পক্ষে পুনরায় তা গ্রহণ করা মুবাহ্ ও জায়েয। কারণ এক্ষেত্রে পিতার জন্য যা কিছু সাব্যস্ত হয়, তা তার নিজের কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য নয়। তার নিজস্ব কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য হলেই তার পক্ষ হতে তার হিবার মাল ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হতো, আর তখনই তার উদাহরণ ঐ কুকুরের মত হতো, যে তার বমি পুনরায় মুখে তুলে নেয়। কিন্তু পিতার জন্য এ অধিকার তো আল্লাহ্ সাব্যস্ত করেছেন এবং এ ব্যাপারে সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।[১০১]

৫. রসূলুল্লাহ্ স. থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে উল্লিখিত আছে, "যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে এর বিনিময় দেয়া না হয় ততক্ষণ হিবাকারী তার হিবার ব্যাপারে অধিক হকদার।"[১০২]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগ থেকেই হিবার প্রচলন হয়। ইজাব-কবূল ও কব্য-এর মাধ্যমে হিবা সংঘটিত হয়। নির্ধারিত শব্দ, শর্ত ও ইসলামী আইন কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মাবলি অনুসরণ করে হিবা করা কর্তব্য। যে সকল বস্তু কেবল হিবা করা যায় তাই হিবা করা উচিত, হারাম বা অবৈধ সম্পদ হিবা করা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ। হিবাকৃত মালে গ্রহণকারীর অধিকার সাব্যস্ত হবে এবং গ্রহণকারী তা থেকে উপকৃত হতে পারবে। হিবা ফেরত নেয়া ইসলাম সম্মত হলেও তা খুবই নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। কিন্তু পিতা কর্তৃক পুত্রকে হিবাকৃত মাল ফেরত নিলে তাতে দোষের কিছু নেই। আমাদের সমাজে হিবা ব্যাপক প্রসার লাভ করলে সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

১০১. ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী, *শারহু মা'আনিউল আছার*, অধ্যায় : আল-হিবা ওয়াস্-সাদাকাহ্, অনুচ্ছেদ : আর-রাজু' ফিল-হিবাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

১০২. *আল-হিদায়া*, পৃ. ৪৮৩ اَلْوَاهِبُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

ইসলামী ফিক্‌হ অধ্যয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*
আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ**

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। এ জীবনব্যবস্থা একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এ দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিবর্তন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরীয়তে যে সকল নিয়ম-কানূন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তাই-ই ইসলামী আইন বা ইসলামী ফিক্‌হ। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা, প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা, অনধিকার চর্চা থেকে মানুষকে বিরত রাখা এবং কর্তব্য পালনে ও দায় বহনে বাধ্য করা। মানুষের মাঝে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশাবলী রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। ইসলামী আইনের প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহ'র উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন প্রয়োজন ও বাস্তবতার আলোকে প্রণীত হয়েছে ইসলামী আইন তথা ইসলামী ফিক্‌হ। কিন্তু ইসলামী আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় গোটা মানবজাতি এর সার্বজনীন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, সমাজব্যবস্থা সীমাহীন আইনী সমস্যাবলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। মূলত কুরআন ও সুন্নাহ'র মৌলনীতি অনুসৃত না হলে কোনো আইন প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগ দ্বারা সমাজে পরিপূর্ণ সমতা, সকলের অধিকার সুরক্ষা এবং শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইসলামী আইন শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে যা ঐতিসাহিক ভাবে প্রমাণিত। ইসলামী আইন তথা ফিক্‌হ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইসলামী ফিক্‌হ অধ্যয়নের পাঠ্যক্রম রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইসলামী ফিক্‌হ অধ্যয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ ধারাকে আরো উন্নত এবং ব্যাপকতা দিতে পারলে আমাদের প্রত্যাশা পাশ্চাত্য আইনের পাশাপাশি ইসলামী আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা লাভ করবে।*]

ইসলামী ফিক্‌হ পরিচিতি

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিক্‌হ (فقه) শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বুঝ ও উপলব্ধি, ব্যুৎপত্তিগত বিদারণ (شق) ও উন্মোচন (فتح) ইত্যাদি।[১] এ প্রসঙ্গে

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।
** সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা।

শু'আইব আ.-এর অনুসারীদের একটি উক্তি আল-কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ "তারা বললো, হে শু'আইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না"।[২] অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ "প্রতিটি জিনিসই তাঁর স-প্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না"।[৩]

ফিক্‌হ শব্দের অপর একটি অর্থ হলো, সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করা। যেমন বলা হয়, فقهت كلامك 'আমি তোমার কথা অনুধাবন করতে পেরেছি।' অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এবং যে তাৎপর্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে আমি তা বুঝেছি।[৪]

ইমাম আল-গাযালী র.বলেন, ফিক্‌হ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীর চিন্তা -ভাবনা ও অনুসন্ধিৎসা, দীনের ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন।[৫] এ প্রেক্ষিতে ফকীহ শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয় : الفقيه العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها. "ফকীহ হচ্ছেন এমন আলিম, যিনি আইন উদ্ভাবন করেন এবং তার প্রকৃত তাৎপর্যগুলো অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।"[৬]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, "আত্মাকে কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিচিতি দেয়া হলো ইসলামী ফিকহের প্রত্যাশা"।[৭]

ইসলামী ফিক্‌হ-এর উদ্দেশ্য

ফিকহ-এর উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহর বিধান বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ অবহিত হওয়া। এর উপকারিতা হলো, আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমল করত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য লাভ করা।[৮]

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৬১৬

২. আল-কুরআন, ১১ : ৯১

৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৪৪

৪. রশীদ রেজা, *তাফসীরুল মানার*, মিশর : দারু সাদির, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৫২১

৫. আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-গাজালী, *ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৪

৬. মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদি আল-বারাকাতী, *কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ*, করাচী : দারুস সদাফ, ১৯৮৬, পৃ. ৪১৪

৭. বাদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ যারকাশী, *আল-মানছুর ফীল কাওয়া'ইদ*, কুয়েত : ওযরাতুল আওকাফি ও শু'য়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫, ১. খ, পৃ. ৬৮

৮. ড. মুহাম্মদ আবূ যুহরা, *উসূল আল-ফিকহ*, মিশর : দারু সাদির, তা.বি., পৃ. ২

العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة الفوز بسعادة الدرين لمعرفة الأحكام الشرعية بالأدلة التفصلية، ولمعرفة الأحكام الله تعالى والعمل .

বাংলাদেশে ইসলামী ফিক্‌হ অধ্যয়ন

ফিক্‌হ হচ্ছে ইসলামী আইন-কানূন ও বিধি-বিধানের সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের নাম। এ শাস্ত্রে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য সুষ্ঠু বিধি-বিধান বর্ণিত রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও পর্যায়ে যেমন, আলিয়া মাদরাসা, কওমী মাদরাসা, পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও রয়েছে ইসলামী ফিক্‌হ চর্চা ও পাঠ্যক্রম।

বাংলাদেশে ইসলামের শুভ সূচনা হয়েছে ইসলাম প্রচারক, মুসলিম ব্যবসায়ী, পর্যটক, ওলী-আউলিয়া ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন খানকা, মক্তব, মসজিদ ও মাদরাসার মাধ্যমে। কালক্রমে মাদরাসা শিক্ষায় বিভিন্ন ধারা তৈরি হয়েছে। আলিয়া মাদরাসা ও কওমী মাদরাসা এসব ধারার অন্যতম।

বাংলাদেশে কওমী মাদরাসাগুলোর মধ্যে চারটি ধারা বিদ্যমান। তন্মধ্যে সংখ্যাধিক্য হলো বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক) নিয়ন্ত্রিত ধারা। সিলেটের আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান 'এদারা' নিয়ন্ত্রিত ধারা; বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনার কিয়দংশের নিয়ন্ত্রণকারী গওহরডাঙ্গা মাদরাসা নিয়ন্ত্রিত ধারা; চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও মেখল নিয়ন্ত্রিত ফারসী-উর্দূকে গুরুত্ব প্রদানকারী ধারা এবং ফারসী-উর্দূর পরিবর্তে আরবীকে প্রাধান্য দানকারী আল্লামা সুলতান যওক নদভী ও মাওলানা আবূ তাহের মিসবাহ প্রবর্তিত মাদানী নিসাব-এর ধারা এবং ইফতার উচ্চতর ডিগ্রী তথা তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্‌হ-এর ধারা। তাছাড়া রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শর্টকোর্স পাঠ্যক্রম। কওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রমে মাদানী নিসাব ও মেখল প্রভাবিত ধারার মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও উচ্চতর শ্রেণি তথা হাদীস ও তাখাস্‌সুস পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম বিশেষ করে ফিক্‌হ পাঠ্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা নেই।

কওমী মাদরাসার স্তরসমূহ

কওমী মাদরাসায় পাঁচটি স্তর রয়েছে। স্তরগুলো হলো : মারহালাতুল ইবতিদায়িয়্যাহ (প্রাইমারি), মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ (মাধ্যমিক), মারহালাতুল ছানুবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক), মারহালাতুল ফযীলত (স্নাতক) এবং মারহালাতুত তাকমীল (স্নাতকোত্তর)।

আলিয়া মাদরাসার স্তরসমূহ

আলিয়া মাদরাসায়ও রয়েছে পাঁচটি স্তর। স্তরগুলো হলো, ইবতিদায়ী (প্রাইমারি), দাখিল (মাধ্যমিক), আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক), ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর)।

কওমী মাদরাসায় ইসলামী ফিক্‌হ অধ্যয়ন

সরকারী অনুদান না নিয়ে জনসাধারণের আর্থিক সহযোগিতায় যে সব মাদরাসা পরিচালিত হয় সেগুলোর অধিকাংশ কওমী মাদরাসা। এ মাদরাসাগুলোর অধিকাংশই ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার অনুসরণ ও অনুকরণে পরিচালিত হয়ে থাকে।

কওমী মাদরাসার প্রাইমারি পর্যায়ে মুফতী কিফায়াতুল্লাহ (১৮৭৫ হি.-১৯৫২ হি.) কর্তৃক রচিত তা'লিমুল ইসলাম উর্দূ বা বাংলা তরজমা পড়ানো হয়। তা ছাড়া মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০ হি.-১৩৬২ হি.) রচিত বেহেশতী জেওর উর্দূ ও বাংলা অনুবাদ পড়ানো হয়।

ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণি থেকে প্রতিটি শ্রেণিতেই একটি করে ফিকহের মৌলিক গ্রন্থ পাঠ্য রয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. রচিত বেহেশতী জেওর উর্দূ ও বাংলা অনুবাদ পড়ানো হয়। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ানো হয় বেহেশতী গওহর। নিম্ন মাধ্যমিক (অষ্টম শ্রেণি সমমান) ইবতেদায়ীতে পড়ানো হয় কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী কর্তৃক (মৃ. ১২২৫ হি.) ফারসী ভাষায় রচিত মালাবুদ্দা মিনহু অথবা শফীকুর রহমান নদভী প্রণীত (রচনাকাল ১৪০২ হি.) আরবী 'আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার'। মুতাওয়াসসিতা উলা-এ (নবম শ্রেণি) পড়ানো হয় হাসান ইবন আম্মার মিসরী (৯৯৪ হি.-১০৬৯ হি.) রচিত আরবী নূরুল ইযাহ। দশম শ্রেণিতে পড়ানো হয় আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪২৮ হি.) রচিত আরবী 'আল-মুখতাসারুল কুদুরী'।

একাদশ শ্রেণির প্রথমবর্ষে পড়ানো হয় আব্দুল্লাহ আবুল বারাকাত ইবন আহমাদ আন-নাসাফী (মৃ. ৭০১ হি.) রচিত 'কানযুদ দাকায়িক' এবং একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় বর্ষে পড়ানো হয় উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন তাজুশ শারী'আহ (মৃ. ৭৪৭ হি.) রচিত 'শরহে বেকায়াহ'। স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়ানো হয় ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন (মৃ. ৩৫৮ হি.) রচিত উত্তরাধিকার আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ 'সিরাজী'। স্নাতক পর্যায়ের প্রতি বর্ষে পড়নো হয় বুরহানুদ্দীন মারগিনানী (৫১১ হি.-৫৯৬ হি.) রচিত আল-হিদায়া গ্রন্থের তাহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, নিকাহ, কসম, হদ্দ, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ।[৯]

স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ানো হয় ক্রয়-বিক্রয় (বুয়ূ) অধ্যায়। তৃতীয় বর্ষে পড়ানো হয় কাফালা, বিচারকের শিষ্টাচার, সাক্ষ্য, ওয়াকালাহ, কসম, সন্ধি, মুদারাবা, হিবা, ইজারা, মুকাতাব, হাজার বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ।[১০]

উসূলুল ফিকহ

নবম শ্রেণিতে উসূলে ফিকহ-এর প্রথম কিতাব হিসেবে পড়ানো হয় নিযাম উদ্দীন আশ-শাশী রচিত 'উসূলে শাশী'; দশম শ্রেণিতে উসূলে ফিকহের কিতাব হিসেবে পড়ানো হয় আল্লামা আহমাদ মুল্লা জীওন (১০৪৮ হি.-১১৩০ হি.) রচিত নূরুল

---

৯. আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, দারুল উলুম, মাদানী নগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত নিসাবুত তালীম, শিশু-দাওরা হাদীস পর্যন্ত প্রণীত সিলেবাস, পৃ. ৩

১০. প্রাগুক্ত

আনওয়ার-এর প্রথম অংশ (কিতাবুল্লাহ)। একাদশ শ্রেণিতে পড়ানো হয় নূরুল আনওয়ার-এর শেষ অংশ (কিতাবুস সুন্নাহ ও কিয়াস)। একাদশ শ্রেণির ২য় বর্ষে পড়ানো হয় আবু আব্দুল্লাহ হুসামী (মৃ. ১১১৯ হি.) রচিত 'মুনতাখাবুল হুসামী' এবং ফযীলত তথা স্নাতক পর্যায়ে পড়ানো হয় মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রচিত 'মুসাল্লামুস সুবুত'।

আহলেহাদীস ধারার কওমী মাদরাসা

বাংলাদেশে বিদ্যমান কওমী মাদরাসাগুলো মধ্যে একটি ধারা হচ্ছে, আহলে হাদীস বা সালাফী ধারা। এই ধারার মাদরাসার কোনো কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড না থাকায় প্রতিটি মাদরাসা নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে। এ ধারার মাদরাসাগুলো কোনো নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ না করায় কোনো একটি মাযহাবের নির্দিষ্ট ফিকহের গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেয় না। এসব মাদরাসায় মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসরণ করে হাদীস ভিত্তিক ফিক্‌হকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। এছাড়া এই ধারার মাদরাসাগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি মাদরাসায় পড়াশুনা শেষ করে সৌদিআরবস্থ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ থাকায় এসব মাদরাসার পাঠ্যক্রমে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের প্রভাব রয়েছে।

আহলে হাদীস ধারার মাদরাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম আহলে হাদীস আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী কর্তৃক ১৯৫৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতুল হাদীস। এ মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরের ১ম বর্ষ থেকেই ফিক্‌হ অধ্যয়ন শুরু হয়। এ শ্রেণিতে আল্লামা মহিউদ্দিন রচিত ফিকহ মুহাম্মাদী (বাংলা) এর ১ম খণ্ডের পানির বিবরণ হতে কবর যিয়ারতের বিবরণের শেষ পর্যন্ত পড়ানো হয়।[১১]

এ স্তরের ২য় বর্ষে একই লেখকের ফিকহ মুহাম্মাদী গ্রন্থের (বাংলা) ২য় খণ্ডের কুরবানীর বিবরণ হতে প্রতিবেশীর অধিকারের শেষ পর্যন্ত পড়ানো করা হয়। ৩য় বর্ষে ফিকহের স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করা না হলেও আল্লামা ইবন হাজার আল-আসকালানী রচিত 'বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম 'গ্রন্থটি পড়ানো হয়। মাধ্যমিক ৪র্থ বর্ষে আল্লামা আবুল হাসান আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী প্রণীত 'আল-মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থটির আত-তাহারাত অধ্যায় থেকে হিবা অধ্যায় পর্যন্ত পড়ানো হয়। এ স্তরের ৫ম বর্ষে ফিকহের স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ পড়ানো হয় না, তবে ইসহাক ইবন ইবরাহীম সমরকান্দী বিরচিত উসূলুশ শাশী নামক উসূলুল ফিক্‌হ গ্রন্থটি পড়ানো হয়। ছানুবিয়্যাহ স্তরের ১ম বর্ষে সাইয়্যিদ সাবিক প্রণীত 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ পড়ানো হয়। এ শ্রেণিতে ড. মুহাম্মাদ

---

১১. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী র.(১৯০০-১৯৬০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল হাদীস', ৯৪, কাযী আলাউদ্দীন রোড, নাযিরা বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত

সুলায়মান আব্দুল্লাহ্ আল-আশকর রচিত 'আল-ওয়াজিহু ফী উসূলিল ফিক্হ' গ্রন্থের শুরু থেকে 'আল মাহকুম ফীহি' পর্যন্ত পড়ানো হয়। কুল্লিয়া স্তরের ১ম ও ২য় বর্ষে ইমাম কাযী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন রূশদ আল-কুরতুবী বিরচিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ' নামক ফিক্হ গ্রন্থটি কিতাবুস সালাম পর্যন্ত পড়ানো হয়।[১২]

ইফতা এবং তাখাসসুস ফিল-ফিক্হ বিভাগ

বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোর বেশ কিছু মাদরাসায় দাওরাহ/তাকমীল স্তর সম্পন্ন করার পর ইসলামী ফিকহে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর কোর্স হিসাবে তাখাসসুস ফিল-ফিক্হ ও ইফতা বিভাগ চালু রয়েছে। এ কোর্সগুলো সাধারণত প্রতি বছর তিন সেমিস্টার করে দুই বছরে ছয় সেমিস্টারে সমাপ্ত হয়। এই বিভাগে তাফসীর ও হাদীস বিষয়ক কিছু কিতাব পড়ানো হলেও মূলত ফিক্হ কেন্দ্রিক কিতাবগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এই বিভাগে ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ, কাওয়াঈদুল ফিক্হ-এর কতিপয় বিখ্যাত কিতাব পড়ানো হয়।

কওমী মাদরাসাগুলোর ইফতা বিভাগে প্রথম বছরে যেসব ফিকহ বিষয়ক কিতাব পড়ানো হয় সেগুলো হলো :

কাওয়াঈদ ফী উলূমিল ফিক্হ, ইসলাম কা ইকতিসাদি নিযাম, শারহু উকূদু রাসমিল মুফতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির এবং আদ-দুররুল মুখতার শারহু তানভীরিল আবসার,[১৩] উসূলুল ইফতা, ফিক্হু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম, আস-সিরাজী ফিল মীরাস, বাহছুল কাওয়াঈদুল ফিকহিয়্যাহ মিনাল মাদখালিল ফিকহিল আম, আল-আহকাম ফী তাময়ীযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম, আদাবুল ইখতিলাফ, আল-মুহাযারাতু আলাল বুনূক,[১৪] ফিকহুল ওয়ারাছাহ ফিল-ইসলাম, বুহুছুন ফী কাযায়া ফিক্হিয়্যাহ মুআসারাহ,[১৫] আহকামুল মাসাইলিল মুতাতাওয়ারাহ আল-জাদীদাহ, কিতাবুল মিসবাহ ফী রাসমিল মুফতী ওয়া মানাহিযিল ইফতা,[১৬] আদাবুল মুফতী, আদাবুল ইখতিলাফি ফী মাসায়িলিল ইলমি ওয়াদ-দীন, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. আল-জামিয়া আল-আহলিয়্যাহ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর তাখাসসুস ফিল-ফিকহ এর সিলেবাস

১৪. আল-জামিয়া আর-রহমানিয়াহ আল আরাবিয়্যাহ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-এর আত-তাখাসসুস ফিল-ফিকহ ওয়াল ইফতা-এর সিলেবাস

১৫. আল-জামিআহ আশ-শারঈয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-এর আত-তাখাসসুস ফিল-ফিকহি ওয়াল ইফতা-এর ১৪৩৩-১৪৩৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস

১৬. মাহাদুল ইকতিসাদ ওয়াল ফিকহিল ইসলামী ঢাকা-এর আত-তাখাসসুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইকতিসাদ-এর সিলেবাস

ফিক্‌হ, আছারুল হাদীস আশ-শারীফ ফী ইখতিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা,[১৭] মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ, কাওয়াঈদুল ফিক্‌হ ইত্যাদি।[১৮]

তাখাসসুস ফিল-ফিকহ ও ইফতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষেও ফিকহের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ পড়ানো হয়। এ সবের মধ্যে রয়েছে আদ-দুররুল মুখতার,[১৯] বুহুছুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ, নিযামুল ব্যাংক আর রাইজ ওয়া তাশকীলুহুল ইসলামী,[২০] আল-ইকতিসাদুল মুআসির ওয়াল মাসায়িলিল জাদীদাহ মিন আনওয়ারিল হিদায়াহ,[২১] আল-ইসলাম ওয়াস সিয়াসাতিল হাযিরাহ, আল-ইকতিসাদুল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল মালিয়্যাহ আল-আম্মাহ, নিযামুল কাযাই ফিল-ইসলাম, আত-তামীন, ইসলাম ওয়াত তিব্বুল হাদীস[২২] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তাখাসসুস ফিল-ফিকহ বা ইফতা বিভাগে উপরোল্লিখিত যেসব গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে এবং পড়ানো হয় সেগুলো ব্যতীতও বেশ কিছু গ্রন্থ এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের মুতালাআহ (অধ্যয়ন) করতে হয়। যেসব গ্রন্থ ও বিষয় মুতালাআহ করানো হয় সেগুলোর অন্যতম হলো : মুকাদ্দামাতু উমদাতুর রিআয়াহ, আন-নাফি আল-কাবীর মুকাদ্দামাতু আল-জামি আস-সগীর, মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ, তারিখুল ফিকহিল ইসলামী, তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, হিদায়া প্রথম খন্ড ফাতহুল কাদীর থেকে ব্যাখ্যাসহ, ফাওয়ায়ে শামী থেকে সাওম, যাকাত ও হাজ্জ অধ্যায়, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি) থেকে তাহারাত, সালাত, যাকাত ও হাজ্জ অধ্যায়, ইমদাদুল ফাতাওয়া, আহসানুল ফাতওয়া, কিফায়াতুল মুফতী, রশীদিয়্যাহ, ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তাহারাত, সালাত, যাকাত, হাজ্জ অধ্যায়সমূহ, আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, নূরুল আনওয়ার, মুকাদ্দামাতু আইনুল হিদায়াহ, ফাতাওয়া দারুল উলূম হাটহাজারী, আল-বাহরুর রায়িক, আল-ফাওয়াহিলুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, আল-বাদায়িউস সানাঈ, ইমদাদুল আহকাম, ইমদাদুল মুফতিয়্যীন, ফাতওয়ায়ে কাযীখান, বাযমাযিয়্যাহ, ফাতাওয়ায়ে আল-কওলুস সাদীদ ফী আহওয়ালিল মাওয়াজীদ,[২৩] ইখতিলাফুল আয়িম্মাহ আওর সিরাতে মুস্তাকীম, আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ,

---

[১৭] আল-মারকাযুল ইসলামী, ঢাকা-এর আত-তাখাসসুস ফিল-ফিকহিল ইসলামী ওয়াল ইফতা-এর সিলেবাস

[১৮] জামিআহ আল-আসআদ আল-ইসলামিয়্যাহ ঢাকা-এর ইফতা বিভাগের ১৪৩২-১৪৩৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস

[১৯] আল-জামিয়াহ আল-আহলিয়্যা দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর সিলেবাস

[২০] আল-জামিয়া আর-রহমানিয়াহ আল-আরাবিয়্যাহ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-এর সিলেবাস

[২১] মাহাদুল ইকতিসাদ ওয়াল ফিকহিল ইসলামী, ঢাকা-এর সিলেবাস

[২২] আল-মারকাযুল ইসলামী, ঢাকা-এর সিলেবাস

[২৩] আল-জামিয়াহ আল-আহলিয়্যাহ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর সিলেবাস

হাদীস আওর আহলে হাদীস মাআ ই'তিরাযিল মাসায়িলিল লাতী ইয়ানতাকিছু ওয়া ইয়াতআনু ফীহা গাইরুল মুকাল্লিদীন, ফাতাওয়ায়ে উছমানী, আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ, কারারাতুল মাজাল্লাতুল মাজমাঈল ফিকহিল ইসলামী, আদালাতী ফয়সালা, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, হামারে আয়িলী মাসায়িল, আল-ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী, ইখতিলাফে উম্মাত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, আছারুল হাদীস আশ-শারীয় ফী ইখতিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা, আল-মাদখাল আল-ফিকহিল আম, তাকলীদ কি শারঈ হাইছিয়াত, রাদ্দুল মুহতার, সুবুলুস সালাম ও ইলাউস সুনান গ্রন্থদ্বয়ের মুআমালাত সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহের তুলনামূলক আলোচনা, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম, আল-ইলাম বিনাকদি কিতাবিল হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম, আস-সিয়াসাহ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া নিযামুল মামলাকাহ, আত-তাশরীঈল জিনাঈল ইসলামী আল-মুকারিন,[২৪] আল-মাদখাল লিদিরাসাতিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, আল-ফিকহ ওয়াল ফুকাহা, শারহুল মাজাল্লাহ,[২৫] জাওয়াহিরুল ফিক্হ, আতরুল হিদায়াহ (عطر الهداية), আলাতে জাদীদাহ কী শরঈ আহকাম, ইসলাম কা নিযামে আরাযী,[২৬] মাজমুআতু মুকাদ্দামাতি ফাতাওয়া ওয়া মুকদিয়্যাতি ফিক্হ, ইযাহুল মাসালিক, হুরমাতু মুসাহারাহ, আল-হীলাতুন নাজিযাহ।[২৭]

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও বেশ কিছু স্বতন্ত্র ফিকহী বিষয়েও এই বিভাগে পড়ানো হয়। সেসব বিষয়ের অন্যমত হলো, আধুনিক অর্থব্যবস্থার পরিচিতি ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক আলোচনা, অংশীদারী ব্যবসায় পরিচিতি, এর আধুনিক রূপ এবং এগুলোর ফিকহী হুকম, বীমা ব্যবসায়, আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ক ফিকহ,[২৮] উরফ, আদাত ও এগুলোর শরঈ হুকম, ইসলামে ইজতিহাদ ও তাকলীদ, এর সীমানা ও শর্তসমূহ, তারজীহ এর হুকম, প্রকার ও নিয়মনীতি,[২৯] আলোকচিত্রের শরঈ বিধান, নারী শিক্ষা, চাঁদ দেখা, স্বাগত সাজদা, গোপনে ও প্রকাশ্যে যিকর,[৩০] ইত্যাদিসহ আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ফিকহি মাসআলা-মাসাইল, আধুনিক সমস্যাসমূহের ফিকহী সমাধান বিষয়ক বহু বিষয় পড়ানো হয়। এই বিভাগে ইফতা'র অনুশীলনও করানো হয়।

---

২৪. আল-জামিআহ আশ-শারঈয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-এর সিলেবাস
২৫. মাহাদুল ইকতিসাদ ওয়াল ফিকহিল ইসলামী, ঢাকা-এর সিলেবাস
২৬. আল-মারকাযুল ইসলামী, ঢাকা-এর সিলেবাস
২৭. জামিআহ আল-আসআদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা-এর সিলেবাস
২৮. আল-জামিআহ আশ-শারঈয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা-এর সিলেবাস
২৯. মাহাদুল ইকতিসাদ ওয়াল ফিকহিল ইসলামী, ঢাকা-এর সিলেবাস
৩০. জামিআহ আল-আসআদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা-এর সিলেবাস

আলিয়া মাদরাসায় ইসলামী ফিকহ্ অধ্যয়ন

বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসাগুলোতে দাখিল স্তরের নিচে কিছু ফিকহী মাসআলার কিতাব পড়ানো হয়, তবে তা কোনো মূল কিতাব থেকে নয়, বরং বিভিন্ন কিতাবাদি থেকে চয়নকৃত। দাখিল স্তর থেকে শুরু হয় মূল কিতাবের পাঠ। তন্মধ্যে নবম ও দশম শ্রেণিতে আল-মুখতাসারুল কুদুরী গ্রন্থের পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, শিকার ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক কিছু মাস'আলা পড়ানো হয়। আলিম শ্রেণিতে দুই শিক্ষাবর্ষে শরহে বেকায়াহ নামক বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থের বিবাহ, তালাক, ব্যবসা, ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।[৩১]

ফাযিল (স্নাতক) স্তর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত ফাযিল স্তরে সিলেবাসভুক্ত বিষয়ের মধ্যেও ফিক্‌হ চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। ফাযিল স্তরে আল-'আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শারী'আহ (২য় পত্র) কোর্সের অধীনে হিদায়া গ্রন্থের কিতাবুল বুয়ূ', কিতাবুল মুদারাবা, কিতাবুল মুয়ারা'আ, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, কিতাবুর রাহিন, কিতাবুল ওসায়া, কিতাবুল মুযাবাহা, কিতাবুর রিবা পড়ানো হয়। আর উসূলে ফিকহের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে 'ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাবাকাতুল ফুকাহা, বিশিষ্ট ফকীহ পরিচিতি, ফকীহ সাহাবীগণ, ফকীহ তাবিয়ীগণ, ইমাম চতুষ্টয়, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হয়। একইভাবে আল-'আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শারী'আহ (৩য় পত্র) কোর্সের অধীনে উসূলুল ফিকহ এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, শরী'আতের উৎসমূহ। কিতাবুল্লাহর সংজ্ঞা, মুশকিল, মুজমাল, মুতাশাবিহ, হাকীকত, মাজায, সরীহ ও কিনায়া, ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস, ইকতিদাউন নস। সুন্নাহ্র সংজ্ঞা ও প্রকার, রাবী পরিচিতি ও শারা'ঈতু রাবী, মুরসাল, মুনকাতা' ও প্রকারসমূহ, 'ইজমা, কিয়াস ইজতিহাদ, মাসালিহুল মুরসালাহ, ইসতিহসান, মাকাসিদুশ শারীআহ। এ ছাড়া ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, উসূলুল ফিক্‌হ-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহ।

একইভাবে ইসলামিক স্টাডিজ (২য় পত্র) শারহু মা'আনিয়িল আছার (তাহাভী শরীফ) গ্রন্থের কিতাবুস সরফ ও আবওয়াবুর রিবা, কিতাবুস সালাত, কিতাবুন নিকাহ পড়ানো হয়।[৩২]

---

৩১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত দাখিল ও আলিম শ্রেণির জন্য প্রণীত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত

৩২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল ও কামিল স্তরের জন্য প্রণীত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত

কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর

কামিল স্তর চারটি বিভাগে বিভক্ত। বিভাগসমূহ হলো : হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ও আদব। এই চারটি বিভাগের মধ্যে ফিকহ বিভাগের প্রথম পর্বে আল-ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, তারিখু ইলমিল ফিকহ ও আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ শিরোনামে চারটি পত্র পড়ানো হয়। দ্বিতীয় পর্বে আল-ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ওয়া মাকাসিদুশ শারীয়াহ, তাবাকাতুল ফুকাহা, কাযা ওয়াস সিয়াসাতুশ শারীয়াহ ও ফিকহুল ইকতিসাদ শিরোনামে চারটি পত্র পড়ানো হয়। প্রথম পর্বের প্রথম পত্র আল-ফিকহ শিরোনামে ইবাদাত ও মু'আশারাত এবং মুসলিম পারিবারিক আইন বিষয় অধ্যয়ন করা হয়। এ পত্রে আবু জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ আল-আযদী আল-মিসরী আত-তাহাভী র. রচিত শারহু মাআনিল আছার গ্রন্থ থেকে কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর, কিতাবুল হুদূদ, কিতাবুল জিনায়াত ও কিতাবুস সিয়ার অধ্যয়ন করা হয়। মুসলিম আইন বিষয়ে বিবাহ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, মাহর, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের বংশ পরিচয়, জন্মের বৈধতা ও স্বীকৃতি, সম্পত্তির অভিভাবকত্ব, আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ অধ্যায়গুলো পড়ানো হয়। এই পত্রের অধীনে বেশ কিছু অধ্যাদেশ ও আইন পড়ানো হয়। সেগুলো হলো, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা ১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৫, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ (সংশোধিত)।

এ স্তরের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পত্রে উসূলুল ফিকহ শিরোনামে আল-ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-বাযদাবী রচিত উসূলুল বায়দাবী গ্রন্থের আনওয়াউল ইলম (ইলমের প্রকারসমূহ) থেকে বাবু মুতাবাআতু আসহাবিন নাবিয়্যি স. ওয়াল ইকতিদা উলাহুম (নবী স. এর সাহাবীগণের অনুসরণ ও অনুকরণ অধ্যায়) পর্যন্ত পড়ানো হয়। এ পত্রের অধীনে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আব্দুল মাহলাবী (عبد المحلاوى) আল-হানাফী রচিত 'তাসহীলুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল' গ্রন্থের মুকাদ্দামাতু ফী তারীফ ইলমিল উসূল ওয়াল ফিক্‌হ থেকে যিকরু মান আল্লাফা ফিল উসূলি মিনাল হানাফিয়্যাহ ওয়া গাইরিহিম এবং আল-মাকসাদুস ছানী ফিল আহকাম থেকে আল-মাসআলাতুল খামিসাহ, জায়িযুত তারকি লাইসা বিওয়াজিব পর্যন্ত পড়ানো হয়।

কামিল ফিকহ প্রথম পর্বের তৃতীয় পত্রে তারীখু ইলমিল ফিকহ শিরোনামে যে বিষয়গুলো পড়ানো হয় সেগুলো হলো : ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ফিকহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, ফিকহ ও তাশরীয়ের মধ্যে পার্থক্য, ফিকহ বা ইসলামী আইন ও মানবরচিত আইনের মধ্যে পার্থক্য, ফিকহ শাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস, ফিক্‌হ

মাযহাবসমূহের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও অবদান, বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্‌হ পরিভাষা, প্রত্যেক মাযহাবের মাসাদেরসমূহ, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের সমসাময়িক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা।

এ স্তরের প্রথম পর্বের চতুর্থ পত্রে আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ শিরোনামে প্রাথমিক আলোচনা হিসেবে যে সব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো :

(১) কাওয়াইদের অর্থ, আল-কাওয়াইদুল উসুলিয়্যাহ এবং আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যার মধ্যে পার্থক্য। (২) ইসলামী শরীয়তে আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা। (৩) আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যার শ্রেণী বিভাগ ও স্তরসমূহ। (৪) ইলমুল ফিকহ, ইলমু উসূলিল ফিকহ ও ইলমু কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যার মধ্যে পার্থক্য। (৫) আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যার ইতিহাস। বিশেষ করে আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদি, গ্রন্থকারদের পরিচিতি।

এই পত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে প্রধান ও বৃহৎ পাঁচটি কায়িদাহ্ এবং এসব কায়িদার শ্রেণিভুক্ত কায়িদাসমূহ পড়ানো হয়। প্রথমোক্ত বৃহৎ পাঁচটি কায়িদা ব্যতীত অন্যান্য প্রায় চৌত্রিশটি সম্পূর্ণ কায়িদা উদাহরণসহ পড়ানো হয়।

কামিল স্তরে ফিকহ বিভাগের দ্বিতীয় পর্বেও প্রথম পর্বের মতো চারটি পত্র রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পত্রে আল-ফিক্‌হ শিরোনামে ইমাম আবু জাফর আহমদ আত-তাহাভী রচিত শারহু মাআনিল আছার গ্রন্থ থেকে কিতাবুল বুয়ূ, কিতাবুস সরফ, কিতাবুল হিবাহ ওয়াস সাদাকাহ, কিতাবুর রাহন, কিতাবুস শুফআহ, কিতাবুল ইজারাত, কিতাবুল কাযা ওয়াশ শাহাদাত, কিতাবুল আশরিবাহ, কিতাবুল কারাহিয়্যা, কিতাবুয যিয়াদাত, কিতাবুল ওয়াসায়া ইত্যাদি পড়ানো হয়। এই পত্রের অধীনে মুসলিম আইন হিসাবে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো, উত্তরাধিকার ও সম্পদের বিলি-বন্টন; উত্তরাধিকার : সাধারণ বিধিমালা; উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হানাফী আইন; উইল (ওয়াসিয়্যা); মৃত্যুকালীন দান ও প্রাপ্তি স্বীকার দান; ওয়াকফ; প্রি এমশন (অগ্রক্রয়)।

দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পত্রে উসূলুল ফিকহ ওয়া মাকাসিদুশ শারীআহ শিরোনামে উসূলুল ফিক্‌হ উপশিরোনামে আল-ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-বাযদাবী রচিত উসূলল বাযদাবী গ্রন্থের বাবুল ইজমা থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান আব্দুল মাহলাবী (عبد المحلاوى) আল-হানাফী রচিত তাসহীলুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ফী মাবাহিছিল কিয়াস থেকে বাহছুল মুরজ্জিহাত (بحث المرجحات) পর্যন্ত পড়ানো হয়।

এই পত্রে মাকাসিদুশ শারীআহ উপশিরোনামে আল-ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী রচিত আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুল মাকাসিদ পড়ানো হয়। আসরারুশ শারীআহ উপশিরোনামে শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দিহলাভী প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থের যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো, মাবহাছুস সাআদাহ, মাবহাছুল বিররি ওয়াল ইছমি, মাবহাছুস সিয়াসাতিল মিল্লিয়্যাহ, মাবহাছু ইস্তিম্বাতিশ শারাঈ (বাবু আসবাবু ইখতিলাফিস সাহাবা ওয়াত তাবিঈনা ফিল ফুল, বাবু আসবাবু ইখতিলাফি মাযাহিবুল ফুকাহা, বাবুল ফারকু বাইনা আহলিল হাদীছি ওয়া আসহাবির রায়, বাবু হিকায়াতি হালিন নাছা কাবলাল মিয়াতির রাবিয়াতি ওয়া বাদাহা) বায়ানু আসরারি মা জাআ আনিন নাবিয়্যি স. তাফসীলান (মিন আবওয়াবিত তাহারাহ, মিন আবওয়াবিস সলাত, মিন আবওয়াবিয যাকাত, মিন আবওয়াবিস সাওম, মিন আবওয়াবি ইবতিগাইর রিযকি মিন আবওয়াবিল মাঈশা)।

দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় পত্রে ত্বাবাকাতুল ফুকাহা, কাযা ওয়াস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ শিরোনামে ফকীহগণের স্তর, ইসলামী বিচারব্যবস্থা, ইসলামী রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা এবং ফতোয়া সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। তাবাকাতুল ফুকাহা উপশিরোনামে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো, সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যকার প্রসিদ্ধ ফকীহ্গণের জীবনী ও অবদান, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত ফকীহগণের জীবনী ও অবদান, পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ফকীহদের জীবনী ও অবদান, ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহগণের জীবন ও কর্ম।

ইসলামী বিচারব্যবস্থা উপশিরোনামে (১) কাযা শব্দের অর্থ, ইসলামী বিচারব্যবস্থার ইতিহাস, (২) ইসলামে বিচার বা কাযার গুরুত্ব ও মৌলিক শর্তাবলি ও আদাবসমূহ, (৩) ইসলামে বিচারকার্যের রীতি বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী বিচার পদ্ধতি, (৪) বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা এবং (৫) দাবি এবং তার প্রমাণাদি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

এই পত্রে ইসলামী রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা উপশিরোনামে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পড়ানো হয় :

(১) ইসলামী রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা, (২) শাসকের যোগ্যতা ও শাসক নির্বাচন পদ্ধতি, (৩) শাসক ও শাসিতের অধিকার এবং (৪) ইসলামী সংবিধানের রূপ-রেখা।

ফাতওয়া উপশিরোনামে ফতোয়ার সংজ্ঞা, হুকুম, ফতোয়া দেয়ার অধিকার ও নিয়ম, ফতোয়া দেয়ার শর্ত ও আদবসমূহ এবং মুফতী ও বিচারকের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ পত্রে ফিকহুল ইকতিসাদ শিরোনামে ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠদান করা হয়। এ পত্রে যেসব বিষয় পাঠদান করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি; ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি; ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক উপাদান (যাকাত, উশর, খারাজ ও সাদাকাহ); চাহিদা ও যোগান; ভোক্তা ও ভোক্তার আচরণবিধি ও ভারসাম্য; মালিকানা তত্ত্ব মালিকানা অর্জনের পন্থা; আয় ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা; উৎপাদন এর উপকরণ ও উৎপাদনবিধি; মজুরি, মজুরিব্যবস্থা, শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক; মূল্য ও বাজারব্যবস্থা; ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্য নির্ধারণ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; করব্যবস্থা, ইসলামের দৃষ্টিতে কর, যাকাত ও কর ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য; সুদ ও মুনাফা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যস্থার তুলনামূলক আলোচনা; ব্যাংকের সংজ্ঞা ও উৎপত্তি; ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; ইসলামী বীমার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমার তুলনামূলক আলোচনা।[৩৩]

বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ইসলামী ফিক্হ অধ্যয়ন

বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইন বিভাগে প্রায় চল্লিশোর্ধ কোর্স থাকলেও ইসলামী আইন তথা ইসলামী ফিক্হ সম্পর্কিত কোর্সের সংখ্যা খুবই কম। যেমন :

ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও লিগ্যাল ফিলোসোফী এন্ড জুরিস্প্রুডেন্স কোর্সের অধীনে শারীআহ ফিক্হ ও ফিকহ শাস্ত্রের পরিচিতি, উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য, দর্শন, উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি, মুসলিম আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স কোর্সের অধীনে ফিক্হ ও শরীয়া পরিচিতি, ফিক্হ ও আইনের মধ্যে পার্থক্য, ইসলামী শরীয়ার বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী আইনের উৎসসমূহ, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামী শরীয়ার বিভিন্ন যুগ যেমন : নবী স.-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ, উমাইয়্যা যুগ থেকে হিজরী ১০০ সন পর্যন্ত, ১০০ হিজরী সন থেকে ৩৫০ হিজরী সন পর্যন্ত, ৩৫০ হিজরী সন থেকে ৬৫৬ হিজরী সন পর্যন্ত এবং ৬৫৬ হিজরী সন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।[৩৪]

এ ছাড়া প্রধান প্রধান ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের মাযহাব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেমন : হানাফী মাযহাব ও বৈশিষ্ট্য, মালিকী মাযহাব ও বৈশিষ্ট্য, শাফি‘ঈ মাযহাব ও বৈশিষ্ট্য এবং

---

৩৩. কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পরিবেশনায় : আল-বারাকা লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

৩৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাস থেকে সংগৃহীত। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু কমবেশি বিষয় রয়েছে। এখানে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়

হাম্বলী মাযহাব ও বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকটি মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবনের কৌশল ও স্তরসমূহ, হানাফী মাযহাবের মাসআলাহ্ উদ্ভাবনের কৌশলসমূহ, সমসাময়িক কালে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী আইনের অবস্থান ও বাস্তবায়ন, কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, তাকলীদ ও তাক্লীফ ইত্যাদি।

মুসলিম সোস্যাল ল' কোর্সের অধীনে ইসলামী ফিক্হর কিছু বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। যেমন :

ক. বিবাহ্ আইন : বিবাহের পরিচয়, বিবাহের রুকন, বিবাহের উপাদান, ইসলামে বিবাহের হুকুম, ওলীমা, বিবাহের পূর্বে রোযা রাখা প্রসঙ্গ, বিবাহের ব্যাপারে অপর পক্ষকে প্রস্তাব দেয়া, বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব, মহর পরিচিতি, ইসলামী আইনে মহরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এ ক্ষেত্রে স্বামীর দায়বদ্ধতা, বহুবিবাহ, বহু বিবাহের প্রকারভেদ, ইসলামে দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অবস্থান ইত্যাদি।

খ. বিবাহ্ বিচ্ছেদ আইন : তালাক পরিচিতি, তালাকের প্রকারভেদ, তালাকের পালনীয় হুকুম, তালাকদানের ক্ষমতা কার? তালাকের রুকন, তালাকের শর্তাবলি, তালাক প্রাপ্তার সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি ইত্যাদি।

The Muslim Marriage and Divorces (Regestration) Act, 1974, The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939, The Muslim Family Laws Ordinance, 1961, The Dowry Prohibition Act, 1980, The Child Marriage Restraint Act 1929, Laws Relating to Succession, Faraaid : Defination mard-al-Mout and of the farrad Laws ইত্যাদি।

এছাড়া মু'আমালাত ও বর্তমান মুসলিম আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা, মুসলিম সংখ্যালঘুদের সমস্যা, সমাধানকল্পে ইসলামী বিধান, মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের জন্য অধিকার, অমুসলিমদের অধিকার রক্ষায় মুসলিম আইনের নিশ্চয়তা ইত্যাদি।

ইসলামিক ল' অব ট্রান্সজেকশন এন্ড ইসলামিক ব্যাংকিং কোর্সের অধীনে মু'আমালাতের ভূমিকা, পরিচিতি এবং মূলনীতিসমূহ, ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন যেমন : সুদ ও জুয়া পরিচিতি এবং এ সম্পর্কে ইসলামী বিধান, ব্যবসায় ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য ও ব্যবসায়ের প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ানো হয়ে থাকে, বীমা, হিবা পরিচিতি, হিবা, যাকাত, সাদকাহ ও হাদিয়ার মধ্যকার পার্থক্য, শুফ'আ পরিচিতি, ইসলামী আইনে শুফ'আ-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, শুফ'আর প্রকারভেদসমূহ, শুফ'আর

বিধান এবং গুরুত্ব, ওয়াক্‌ফ : পরিচিতি, অভিভাবকত্ব আইন ও পিতৃত্ব সংক্রান্ত আইনের অধ্যয়ন।[৩৫]

ইসলামিক ক্রিমিন্যাল ল' কোর্সের অধীনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পড়ানো হয় :
ইসলামী আইনের দর্শন, প্রচলিত আইনের দর্শন, ইসলামি অপরাধ আইনের সংজ্ঞা, ইবাদাত ও মু'আমালাতের মাধ্যকার সম্পর্ক, ইসলামী অপরাধ আইন ও অপরাধী, অপরাধ ও ইসলামি দর্শন, অপরাধীর শাস্তি, ইসলামে অপরাধ আইন ও প্রচলিত অপরাধ আইনের মধ্যকার পার্থক্য, অপরাধ পরিচিতি, প্রচলিত ও ইসলামে অপরাধ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ পরিচিতি, পাপ ও ভুলের মধ্যকার সম্পর্ক, তাওবার পরিচিতি, তাওবার গুরুত্ব ও ইসলামী আইনে তাওবার অবস্থান, ইসলামে অপরাধ আইনের মূলনীতি ও প্রকারভেদ।

এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন আইন সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। যেমন : নরহত্যার সংজ্ঞা, নরহত্যার শাস্তি, ইসলামী আইনে নরহত্যার শাস্তি প্রদানের গুরুত্ব, মানবদেহে আঘাত হানার শাস্তি, যৌন অপরাধ এর সংজ্ঞা, ধর্ষণ ও ব্যভিচারের মধ্যকার পার্থক্য, যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ, গীবাত, মিথ্যা অপবাদ ও গীবাতের শাস্তি ও শাস্তির গুরুত্ব, হদ্দযোগ্য চুরির সংজ্ঞা, ইসলামে চুরির শাস্তি ও দর্শন, নেশা করা ও নেশার শাস্তি, সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার শাস্তি, রাষ্ট্রদ্রোহ, ইসলামী আইনে বিদ্রোহের শাস্তি, তা'যীর, তা'যীরী শাস্তির ধরণ ও প্রকারভেদ এবং ক্ষেত্র ইত্যাদি।[৩৬]

ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ল' কোর্সের অধীনে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পরিচিতি, জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনপ্রসঙ্গ, এ প্রসঙ্গে ইসলামের মূলনীতি ইত্যাদি, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের দর্শন, ইবাদত ও মুআমালাতের সাথে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের সম্পর্ক, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে যোগাযোগের শ্রেণিবিন্যাস, দারুল ইসলাম, দারুল কুফ্‌র, দারুল আমান, দারুল হারব পরিচিতি, ইসলামে যুদ্ধনীতি ও ইসলামী রাষ্ট্রে

---

৩৫. উল্লিখিত তথ্যগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাস থেকে সংগৃহীত

৩৬. উল্লেখিত তথ্যগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাস থেকে সংগৃহীত। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা কমবেশি উল্লেখ করা আছে যা উল্লেখযোগ্য নয়

সংখ্যালঘুদের তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে।[৩৭]

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ফিক্‌হ অধ্যয়ন

বাংলাদেশের পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেও প্রায় চল্লিশোর্ধ কোর্স পড়ানো হয়। তবে এ বিভাগের ইসলামী বিষয় সম্বলিত অনেক কোর্স থাকলেও সরাসরি ইসলামী ফিক্‌হ সম্পর্কিত কোর্সের সংখ্যা খুবই কম। যেমন :

আহকামুশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ কোর্সের অধীনে ইসলামী ফিক্‌হের প্রাথমিক কিছু ধারণা উল্লেখপূর্বক মানবজীবনে অতি প্রয়োজনীয় কিছু হুকুম আহকাম সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। যেমন : ইসলামী আইনের পরিচিতি, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

এ ছাড়া পবিত্রতার সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রকারভেদ ও হুকুমসমূহ, সালাত, সালাতের গুরুত্ব, হুকুম, রুকনসমূহ, সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ, সালাত ত্যাগকারীর হুকুম, জামায়াতে নামায আদায়, রুগ্ন ব্যক্তি ও মুসাফিরের নামাযের হুকুম, জানাযার সালাতের হুকুম, জুমু'আ সালাতের হুকুম ও গুরুত্ব, দুই ঈদের সালাতের হুকুম, যাকাত পরিচিতি, গুরুত্ব, যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ, কার উপর ও কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। সাওম, সাওমের প্রকারভেদ, সাওমের উপকারিতা ও সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ।

হদ্দ পরিচিতি, ধর্মত্যাগী (ইরতিদাদ), চুরি, মদ পান করা, ব্যভিচার, অপবাদের শাস্তি হত্যার শাস্তি ও তা'যীরী হুকুম, মীরাসের হুকুম, হজ্জ ও উমরা পরিচিতি, গুরুত্ব ও হুকুমসমূহ, সমকালীন কিছু মাস'আলাহ যেমন : ব্যাংকের উপকারিতা, বর্গাচাষ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সহযোগিতা নেয়া-দেয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ানো হয়।

এছাড়া সূরা আল-বাকারা, সূরা আন-নিসা, সূরা আল-মায়িদা, সূরা আল-আ'রাফ, সূরা হূদ ও সূরা আন-নূর-এ বর্ণিত আহকাম সম্পর্কিত আয়াতগুলোর তাফসীর।

উল্লেখিত কোর্সসমূহের পাশাপাশি তুলনামূলক ফিক্‌হ শিরোনামেও একটি কোর্স পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এ কোর্সের অধীনে তুলনামূলক ফিক্‌হ-এর সংজ্ঞা, ঐতিহাসিক পটভূমি ও উপকারিতা, তুলনামূলক ফিক্‌হের মূলনীতি, তুলনামূলক ফিক্‌হর মূলনীতি ও ফিক্‌হর কাওয়া'য়িদের মধ্যকার পার্থক্য, ফিক্‌হী চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মাধ্যম কী কী? ফকীহগণের মধ্যকার মতভেদের কারণ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে।

---

৩৭. বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাস থেকে সংগৃহীত

এ ছাড়া সমসমায়িক কিছু তুলনামূলক ফিকহী মাস'আলাও এ কোর্সের অধীনে পড়নো হয়ে থাকে। যেমন, ওযুর নিয়ত প্রসঙ্গ, লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ প্রসঙ্গে, নাবালকের যাকাত, মাসালিহিল 'আম্মা-এর দৃষ্টিতে যাকাত প্রদানের খাতসমূহ ইত্যাদি।[৩৮]

এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন আইন সম্পর্কেও অতি সংক্ষেপে ধারণা দেয়া হয়। যেমনঃ **ইসলামে কিসাস আইন** : নরহত্যার সংজ্ঞা, নরহত্যার শাস্তি, ইসলামী আইনে নরহত্যার শাস্তি প্রদানের গুরুত্ব, মানবদেহে আঘাতের শাস্তি।

হুদ্দ সম্পর্কিত আইন : এটি কয়েকপ্রকার। যথা :
(ক) বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর মধ্যকার যৌনমিলন এবং শাস্তি, (খ) মিথ্যা অপবাদ ও গীবাত, (গ) চুরি, (ঘ) মাদকতা, (ঙ) সন্ত্রাস এবং (চ) রাষ্ট্রদ্রোহ।

তা'যীরী অপরাধ : তা'যীর-এর সংজ্ঞা, তা'যীরী শাস্তির ধরন ও প্রকারভেদ এবং ক্ষেত্রসমূহ।[৩৯] এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত **'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'**-এ **'ফিক্হ বিভাগ'** নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগের অধীনে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন তথা ইসলামী ফিক্হ বিষয়ক সর্বমোট ৪২টি কোর্স রয়েছে। উক্ত কোর্সসমূহের মধ্যে ১৩ (তের) টি কোর্স সরাসরি ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিম্নে এ বিভাগে ইসলামী ফিক্হ সম্পর্কিত যেসকল কোর্স পড়ানো হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

অত্র বিভাগের 'ইনট্রোডাকশন টু আল-ফিক্হ' কোর্সের অধীনে যে সকল বিষয় পড়ানো হয় তা হলো, ফিক্হ ও শরীয়ার সংজ্ঞা, ফিক্হ ও আইনের মধ্যে পার্থক্য, ইসলামী শরীয়ার বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী আইনের উৎসসমূহ, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামী শরীয়াহর বিভিন্ন যুগ যেমন : নবী স.-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ, উমাইয়্যা যুগ থেকে হিজরী ১০০ সন পর্যন্ত, ১০০ হিজরী সন থেকে ৩৫০ হিজরী সন পর্যন্ত, ৩৫০ হিজরী সন থেকে ৬৫৬ হিজরী সন পর্যন্ত এবং ৬৫৬ হিজরী সন থেকে

---

৩৮. উল্লেখিত তথ্যগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস থেকে সংগৃহীত। অবশ্য উল্লেখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে

৩৯. উল্লেখিত তথ্যগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, পিপল্‌স ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস থেকে সংগৃহীত। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা কমবেশি উল্লেখ করা আছে যা উল্লেখযোগ্য নয়

বর্তমান যুগ পর্যন্ত, প্রধান প্রধান ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের মাযহাব ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেমন : হানাফী মাযহাব ও এর বৈশিষ্ট্য, মালিকী মাযহাব ও এর বৈশিষ্ট্য, শাফিঈ মাযহাব ও এর বৈশিষ্ট্য এবং হম্বলী মাযহাব ও এর বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবনের কৌশল ও স্তরসমূহ, হানাফী মাযহাবের মাসআলাহ উদ্ভাবনের কৌশলসমূহ, সমসাময়িক কালে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী আইনের অবস্থান ও বাস্তবায়ন, ইজতিহাদ, তাকলীদ ও তাকলীফ ইত্যাদি।[৪০]

'লিগ্যাল টেক্সট অব আল-কুরআন' কোর্সের অধীনে আল-কুরআনে বর্ণিত ইসলামী আইন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সূরা, আয়াতের তাফসীর ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসআলা সম্পর্কে পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন :

বিবাহের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২১; সূরা নিসা, আয়াত : ১-৪; সূরা আল-মাইদা, আয়াত : ৫; সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩২-৩৩; সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫০-৫২; সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ১০-১৩; ।

হিযাব ও অনুমতি প্রার্থনার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১-৩২; সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৩-৫৪, ৫৯।

অবিবাহিত লোকের করণীয় সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৯-২৪।

ঋতুস্রাবের সময় একজন মহিলার কী করা উচিত বা ঐ সময়কার বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২২-২২৩।

স্তন্যদান ও ভ্রূণতত্ত্ব বিধানের সাথে ইসলামী ফিক্হ সম্পর্কিত আলোচনা সংশ্লিষ্ট আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৩; সূরা লুকমান, আয়াত : ১৪; সূরা আল-আহকাফ, আয়াত : ১৫; সূরা আত-তালাক, আয়াত : ৬-৭।

বিবাহের প্রস্তাব সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫-২৩৭।

তালাকের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২২৮-২৩১, ২৩৫-২৩৭; সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৪৯; সূরা আত-তালাক, আয়াত : ১-৩।

ইদ্দতের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮-২৩১, ২৩৪, সূরা আত-ত্বালাক্ব, আয়াত : ৪-৭।

তালাক দেয়ার পূর্বে সতর্ক করার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৪-৩৬।

---

[৪০]. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিক্হ বিভাগ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত, পৃ. ৪

'ইলার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২৬-২২৭।

যিহারের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : ১-৪।

মীরাসের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১-১২, ১৭৬।

লি'আনের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নূর, আয়াত : ৬-১০।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৭৫, ২৮২; সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৯; সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৭; সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত : ৯।

সুদের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৭৫-২৮১; সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৩০; সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৬১; সূরা আর-রূম : ৩৯।

ঋণ ও সাক্ষ্য দেয়ার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৮২-২৮৩।

হদ্দ ও তা'যীরী শাস্তির বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ : আলোচ্য শিরোনামে কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

যাদু ও যাদুকর বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১০১-১০৩

মদ ও মাদক, জুয়ার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১৯-২২০; সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪৩; সূরা আল-মাইদা, আয়াত : ৮৯-৯২।

নরহত্যার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৯২-৯৪; সূরা আল-মাইদা, আয়াত : ৪৫।

চুরির বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩৮-৩৯।

ব্যভিচারের শাস্তির বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নূর, আয়াত : ১-৩।

সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ (কাযফ)-এর শাস্তির বিধান সম্পর্কিত আয়াত :সূরা আন-নূর, আয়াত : ৪-৫।

ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তির বিধান সম্পর্কিত আয়াত :সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩২-৩৪।

ইয়াতীমদের মালামাল হস্তান্তর সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫-১০।

জিহাদের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯০-১৯৫, ২১৬-২১৭; সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৪, সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৬৫; সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ২৪, ১১১; সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ৫৮, ৭৮; সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৫২; সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ৪; সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ১।

গণীমাতের মালের বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ১-৪; সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৬-১০।

হিয়াল ও কাফালার বিধান সম্পর্কিত আয়াত : সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৭২।[৪১]

'লিগ্যাল টেক্সট অফ আস-সুন্নাহ' কোর্সের অধীনে হাদীসে বর্ণিত ইসলামী আইন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসআলা সম্পর্কে পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন :
বিবাহের বিধান, পর্দা, অনুমতির প্রার্থনার বিধান, অবিবাহিত লোকের করণীয়, ঋতুস্রাবের সময় একজন মহিলার কী করা উচিত বা ঐ সময়কার বিধি-বিধান, বিবাহের প্রস্তাব সংক্রান্ত বিধি-বিধান, তালাকের বিধান, ইদ্দাতের বিধান, তালাক দেয়ার পূর্বে সতর্ক করার বিধান, 'ইলার বিধান, যিহারের বিধান, মীরাছের বিধান, লি'আনের বিধান, ব্যবসায়ের বিধান, সুদের বিধান, ঋণ ও সাক্ষ্য দেয়ার বিধান, হদ্দ ও তা'যীরী শাস্তির বিধান, যাদু ও যাদুকর বিধান, মদ ও মাদক, জুয়ার বিধান, হত্যার বিধান, চুরির বিধান, ব্যভিচারের শাস্তির বিধান, সতী-সাধ্বী রমণীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান, ইয়াতীমদের মালামাল হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধিবিধানের, জিহাদের বিধান, গণীমাতের মালের বিধান ইত্যাদি।[৪২]

অত্র বিভাগে ইসলামী ফিক্‌হর মূলনীতি সম্পর্কিত দু'টি কোর্স পড়ানো হয়। তন্মধ্যে উসূলুল ফিক্‌হ (পার্ট-১)' কোর্সের অধীনে উসূলে ফিক্‌হের মৌলিক বিষয়সমূহ, ইসলামের বিভিন্ন হুকুম যেমন : (ক) ওয়াজিব, জায়িজ, মাকরূহ এবং হারাম ইত্যাদি, শরীয়াতের দলীল নির্ধারণের বিষয়গুলো, যেমন : আম, খাস, মুস্তাক, মুওয়াওয়াল, মুতলাক্ব, মুকায়্যিদ, নাসিখ, মানসুখ, নস, যাহির, মুফাস্‌সার, মুহকাম, খাফী, মুসকিল, মুতাশাবিহ এবং হানাফী মাযহাবের ভিত্তিতে নসের প্রকারসমূহ, যথা : ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস, ইকতিযাউন নস ইত্যাদি। হানাফী মাযহাব ব্যতীত যথা : আল-মানতুক ও আল-মাফহুম ইত্যাদি বিষয়সমূহ পাঠদান করা হয়ে থাকে।[৪৩]

'ইসলামিক পারসোনাল ল' কোর্সের অধীনে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন :

---

৪১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিক্‌হ বিভাগ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত, পৃ. ১১-১২
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫
৪৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিক্‌হ বিভাগ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত, পৃ. ২৬-২৭

এক. আকীদা সম্পর্কিত বিধিবিধানসমূহ

ক. মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ভূমিকা

১. ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে আকীদার অর্থ।

২. সালাফ-এর অর্থ, আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের পরিচয় এবং আহ্‌লুস সুন্নাত ওযাল জামা'আতের আর যে সকল নাম রয়েছে সেগুলো।

৩. আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আকীদাসমূহ।

৪. আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আকীদাসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি।

খ. ঈমান : ঈমানের অর্থ ও ঈমান আনয়নের জন্য উৎসাহিত করা প্রসঙ্গ। এটি নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন :

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান : যেমন, তাওহীদ পরিচিতি, তাওহীদের প্রকারসমূহ। শিরক পরিচিতি, শিরকের প্রকারভেদ, তাওহীদে উলূহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত ও আসমায়ে জাতের মধ্যে মানুষ কিভাবে শিরক করে সে সম্পর্কি আলোচনা। আল্লাহ্‌র গায়েবী শক্তি, আরশ, কুরসি যেগুলো আল্লাহ্ যে সর্বশক্তিমান তা প্রমাণ করে।

ফিরিশতার প্রতি বিশ্বাস : ফিরিশতার পরিচয়, স্তরসমূহ, ফিরিশতা ও সৎমানুষের মধ্যে পার্থক্য।

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান : আসমানী কিতাবের পরিচয়, আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সহীফা ও কিতাবের মধ্যে পার্থক্য এবং আল-কুরআনের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

রসূলগণের প্রতি ঈমান : রসূলগণের প্রতি ঈমান, রসূলগণের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, নবী ও সংবাদবাহকের মধ্যে পার্থক্য, নবূওয়াতের দায়িত্ব। মুহাম্মদ স.-এর প্রতি ঈমান, তাঁর নবূওয়াত ও দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে। ইসলাম প্রচারে সাহাবীগণের অবস্থান।

শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান : নফস ও রূহ পরিচিতি, পাপের পরিণাম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, বিচার দিবসের বিভিন্ন বিষয় যেমন : হাউজে কাউছার, হিসাব, মীযান, সীরাত ইত্যাদি।

কাযা ও কদরের প্রতি ঈমান : কাযা ও কদর পরিচিতি, লাওহে মাহফুজে ভাগ্য লিখিত রয়েছে এ ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন মত। ভাগ্য সম্পর্কে আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জায়াআত, জাবরিয়া, কাদেরিয়া, মু'তাজিলাদের অভিমত।

কুফর : কুফর পরিচিতি, কুফরের প্রকারভেদ।

ইসলাম : ইসলাম পরিচিতি, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"-এর ব্যাখ্যা। সালাত, যাকাত, ইমামত, ইমামতির জন্য বিধান, জামায়াত, জামায়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি। সুন্নাহ ও বিদায়াত পরিচিতি এবং প্রকারসমূহ।

দুই. ইবাদত

বাংলাদেশে মুসলিম আইনের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, বর্তমান সময়ে মুসলিম আইন, মুসলিম আইন ও শরীয়ার মধ্যে পার্থক্য, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ও মুসলিম সামাজিক আইনের সম্পর্ক এবং পার্থক্য।

সাক্ষ্য আইন পরিচিতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সালাতের বিধান এবং গুরুত্ব ও তাৎপর্য, যাকাতের বিধান পরিচিতি এবং গুরুত্ব ও তাৎপর্য, হজ্জ ও কুরবানীর মধ্যে সম্পর্ক এবং গুরুত্ব ও তাৎপর্য, জিহাদ পরিচিতি, গুরুত্ব এবং জিহাদ ও মুজাহাদার মধ্যে সম্পর্ক কেসস্টাডিসহ উদাহরণ।[৪৪]

একইভাবে 'ইসলামিক সোস্যাল ল' ' কোর্সের অধীনে ইসলামী ফিক্হ সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয় পাঠদান করা হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

মুয়াশারাত পরিচিতি, ইসলামী আইনে মুয়াশারাতের ভিত্তিসমূহ এবং মৌলিক বিষয়সমূহ।

মুসলিম পারিবারিক আইন : এটি কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন : বিবাহ আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, যিহার, লি'আন ইত্যাদি।

মুসলিম সামাজিক আইনের অধীনে যে সকল আইন অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবিধানগুলো হলো :

ক. The Muslim Marriage and Divorces (Regestration) Act, 1974.
খ. The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.
গ. The Muslim Family Laws Ordinance, 1961.
ঘ. The Dowry Prohibition Act, 1980.
ঙ. The Child Marriage Restraint Act 1929.
চ. Laws Relating to Succession, Faraaid : Defination, marad-al-Mout and of the farrad Laws.[৪৫]

---

৪৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিক্হ বিভাগ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত, পৃ. ২৮-৩২

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

অত্র বিভাগে 'ল' অব ট্রান্সেকশন এন্ড সাকসেশন ইন ইসলাম' নামে একটি কোর্স রয়েছে। উক্ত কোর্সের অধীনে ইসলামী আইনের লেনদেন ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন :

ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন

ক. সুদ ও জুয়া পরিচিতি এবং এ সম্পর্কে ইসলামী বিধান।

খ. ব্যবসায় ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য।

গ. ব্যবসায়ের প্রকারভেদ।

হিবা, শুফাআ, ওয়াক্‌ফ ও অভিভাবকত্ব

মুআমালাত : মু'আমালাতের ভূমিকা, পরিচিতি এবং মূলনীতিসমূহ, মুআমালাত ও বর্তমান মুসলিম আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানকল্পে ইসলামী বিধান, মুসলিম সমাজে তাদের অধিকার, তাদের অধিকার রক্ষায় মুসলিম আইনের গ্যারান্টি ইত্যাদি।[৪৬]

অত্র বিভাগে ইসলামী ফিক্‌হের মূলনীতি সম্পর্কিত দু'টি কোর্স পড়ানো হয়। তন্মধ্যে 'উসূলুল ফিক্‌হ (পার্ট-২)' কোর্সের অধীনে ফিক্‌হর উৎসসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন : আল-কুরআন পরিচিতি, বিধিবিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মৌলিক পর্যালোচনা, সুন্নাহ পরিচিতি, সুন্নাতের প্রকারভেদ, বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মৌলিক পর্যালোচনা, 'ইজমার পরিচয়, ইজমার প্রকারভেদ, ইসলামী আইনে ইজমার গুরুত্ব ও অবস্থান, কিয়াসের পরিচয়, ইসলামী আইনে কিয়াসের গুরুত্ব ও অবস্থান, ইস্তিহসান পরিচিতি, ইসলামী আইনে ইস্তিহসানের গুরুত্ব ও অবস্থান, মাসালিহিল মুরসালা, ইজতিহাদ পরিচিতি, প্রকারভেদ, মুজতাহিদদের প্রকার বা স্তরসমূহ, কোন কোন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা যায়, ইজতিহাদের উৎস, ইসলামী আইনে ইজতিহাদের অবস্থান, তাকলীদ পরিচিতি, প্রকারভেদ, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকলীদ করা যায়, ইসলামী আইনে তাকলীদের অবস্থান ইত্যাদি।

এ ছাড়া আইনের উৎস ও মূলনীতির মধ্যকার পার্থক্য, ফাতওয়া পরিচিতি, ফাতওয়া ও আইনের মধ্যকার সম্পর্ক, ফাতওয়ার ক্রমবিকাশ, ফাতওয়া জানার পদ্ধতি, ফাতওয়ার মূল কাজ, মুফতীর আদব ও গুণাবলী, ইসলামী আইনে ফাতওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য।[৪৭]

---

৪৬. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিক্‌হ বিভাগ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত, পৃ. ৪৪-৪৫

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

'পেনাল ল' ইন ইসলাম' কোর্সের অধীনে একজন মুসলিমের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সমস্ত স্তরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধনকল্পে কুর'আন, হাদীস ও অন্যান্য উৎসের আলোকে সমাধান ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন :

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ বিজ্ঞান ও অপরাধ দর্শন : ইসলামী আইনের দর্শন, প্রচলিত আইনের দর্শন, ইসলামী অপরাধ আইনের সংজ্ঞা, ইবাদাত ও মু'আমালাতের মাধ্যকার সম্পর্ক, অপরাধ আইন ও অপরাধী, অপরাধ ও ইসলামী দর্শন, অপরাধীর শাস্তি, ইসলামের অপরাধ আইন ও প্রচলিত অপরাধ আইনের মধ্যকার পার্থক্য, প্রচলিত ও ইসলামের অপরাধ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধের সংজ্ঞা, পাপ ও ভুলের মধ্যকার সম্পর্ক ও তাওবাহর গুরুত্ব ও ইসলামী আইনে তাওবার অবস্থান, ইসলামী অপরাধ আইনের মূলনীতি ও প্রকারভেদ।

এ ছাড়া মানবজীবনে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেও পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন :

১. **ইসলামে কিসাস আইন :** হত্যা পরিচিতি, হত্যার শাস্তি, ইসলামী আইনে হত্যার শাস্তি প্রদানের গুরুত্ব ও আঘাতের শাস্তি।

২. **হদ্দ সম্পর্কিত আইন :** এটি কয়েক প্রকার। যথা :

(ক) বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর মধ্যকার যৌনমিলন এবং শাস্তি যৌন অপরাধ, (খ) মিথ্যা অপবাদ ও গীবাত, (গ) চুরি, (ঘ) মাদকতা, (ঙ) সন্ত্রাস এবং (চ) রাষ্ট্রদোহ।

৩. **তা'যীরী অপরাধ**[৪৮]

অত্র বিভাগের অধীনে 'ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ল' নামে একটি কোর্স চালু রয়েছে। যে কোর্সের অধীনে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বহিঃর্বিশ্বের সাথে কী কী বিষয়ে সম্পর্ক রাখা ও দু' দেশের মধ্যকার সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন কী বলেছে সেসকল বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পরিচিতি, জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন প্রসঙ্গ, এ প্রসঙ্গে ইসলামী মূলনীতিসমূহ, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের দর্শন, ইবাদত ও মুআমালাতের সাথে ইসলামী আন্ত র্জাতিক আইনের সম্পর্ক, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে যোগাযোগের শ্রেণি বিন্যাস, দারুল ইসলাম, দারুল আমান, দারুল হারব পরিচিতি, ইসলামে যুদ্ধনীতি ও ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের তথা অমুসলিমদের অধিকার ইত্যাদি।

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯

'ইসলামিক ল' অব রিসেন্ট ইস্যুস (ফিকহুন নাওয়াযিল)' কোর্সের অধীনে একজন মুসলিমের জীবনে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য উৎসের আলোকে সমাধান বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। যেমন : 'ফিক্‌হুন নাওয়াযিল' পরিচিতি, এ বিষয়ে অধ্যয়নের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা। ইসলামী আইনে সমসাময়িক কিছু বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা।

সাবান, মাটি, পবিত্র কোনো বস্ত্র দিয়ে পানি পরিস্কার করা, শুকনো বস্ত্র পবিত্র করার নিয়ম, দাঁত বাধানো প্রসঙ্গে। কোনো কেমিক্যাল দিয়ে নখ, চুল, পশম উঠানো বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ বিকৃত করা, চোখের পাপড়ি উপড়ানো, নেল পালিশ ও শরীরে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ব্যবহার করে সাজসজ্জা করা, আমিষ জাতীয় কোনো বা পানি ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্য দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের হুকুম ইত্যাদি।

বিভিন্ন নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে, যা সতর ও আবরু ইজ্জতের সাথে সম্পৃক্ত, প্যান্ট ও বেল্টসহ নামায আদায় করা, সিঙ্গা বহনকারীর নামায, আযানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, কিবলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, নৌকা ও বিমানে নামায আদায় প্রসঙ্গে, মসজিদে পুরুষের পিছনে নারীদের নামায আদায় প্রসঙ্গে, ধুমপান করে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় প্রসঙ্গে, রাস্তায় ইমামের তাকবীরের আওয়াজ শুনলে তা অনুসরণ প্রসঙ্গে, মুসাল্লির সামনে গরম করার যন্ত্র রাখা প্রসঙ্গে, বাধাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য জামাতে নামায আদায়ের হুকুম, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা বোঝে না তার জন্য জুমু'আর নামাযের পর (বাংলা ভাষায়) অনুবাদ করে দেয়ার হুকুম, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নামাযের বিধান, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করা প্রসঙ্গে, মৃতের দেহের পরীক্ষা বা ময়না তদন্ত (Postmortem), মৃতব্যক্তিকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তর ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

কারেন্সি নোট, প্রাইজ বন্ড, মুরাবাহা ব্যবসায়, জীবন বীমা, ক্রেডিট এবং ক্রেডিট কার্ড, স্টক কোম্পানী, শেয়ার ব্যবসা, ব্যাংক ও ব্যাংকের লেন-দেন সম্পর্কিত, সুদ, স্বত্ব বিক্রি, ক্লোনিং, অর্গান ডোনেশন ইত্যাদি।[৪৯]

ফিক্‌হ হচ্ছে ইসলামী আইন-কানূন, বিধি-বিধানের সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের পরিভাষার নাম। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ইসলামের সুষ্ঠু আইন-কানূন, বিধি-বিধান রয়েছে।

---

৪৯. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিক্‌হ বিভাগ থেকে প্রকাশিত সিলেবাস থেকে সংগৃহীত, পৃ. ৬২-৬৭

উপসংহার

'ইসলামী ফিক্হ' ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের বিশাল স্থান দখল করে আছে। কারণ এটি এমন আইন যা দ্বারা প্রত্যেক মুসলমান তার প্রতিদিনের কার্যক্রমকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে পারে, কাজটি হালাল না হারাম, সঠিক না ভুল? সব যুগেই মুসলমানগণ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন তা হালাল না হারাম, সঠিক না ভুল, হোক সেটি আল্লাহ্ বা তাঁর বান্দা সম্পর্কিত অথবা বান্দাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কিত। আর এসব বিষয় শুধু ফিক্হের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। যদিও উল্লিখিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এগুলোর দ্বারা একজন শিক্ষার্থী শুধু মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কেই জানতে পারে কিন্তু ব্যাপক গবেষণা করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। কেননা সেখানে উন্মুক্ত গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না বা দেয়া হয় না। তারপরও এ ধারাকেই অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ফিক্হ বিষয় অধ্যয়ন বা পাঠদান করা হয়ে থাকে, যার অন্যতম লক্ষ্য হলো, জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে রচনার নির্যাস, গভীরতার সাথে সমাধান নির্দেশক ও সমন্বিত চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত গবেষণা দ্বারা ফিক্হ জ্ঞানকে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় ও এদেশের মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

ইসলামে বীমা ব্যবস্থা : মৌলভিত্তি ও বাংলাদেশে-এর বিস্তার

মো: অহিদুজ্জামান সরকার*
হাসনা ফেরদৌসী**

[**সারসংক্ষেপ** : *সাধারণত বীমা বলতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকে বুঝায়। বীমা হলো এমন একদল লোকের ব্যবস্থা যাদের মধ্যকার কেউ কোনো ক্ষতি বা বিপদের শিকার হয় যার পরিণতি পূর্ব থেকে অনুমান করা যায়, তার উপর যখনই এ ধরনের বিপদ আসে তখনই সেই বিপদের ক্ষয়ক্ষতি পুরো দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ইসলামী বীমা পদ্ধতিকে শিরকাত আত-তাকাফুল আল-ইসলামিয়্যাহও বলা হয়। এর মূলকথা হলো, পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। হালাল উপায়ে উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি সহযোগী সদস্যদের কারো উপর বিপদ আপদ পতিত হলে সেই দুঃসময়ে তার পাশে দাঁড়াবার প্রক্রিয়াই হল তাকাফুলের মূলকথা। সমকালীন শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ নীতিগতভাবে সুদ ও শরীয়ত নিষিদ্ধ অন্যান্য পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা না করার শর্তে সমবায় বা সহযোগিতা ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। তাকাফুলের ধারণা মূলত তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাঙ্ক্ষা, ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা এবং আগাম সতর্কতা। এই তিনটি উপাদানই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এই তিনটি মৌলিক বিষয় ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সৎকর্ম সম্পাদন ও আল্লাহভীতি অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পরকে সহায়তা করার ইসলামী মূলনীতির উপর তাকাফুল বা বীমা সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিশীল। বীমা ব্যবস্থায় যে ব্যবসায় বা বাণিজ্যিক উপাদান আছে তার সব কিছুই সম্পাদন করতে হয় ইসলামী মূলনীতির আলোকে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয় পরিপূরক হিসেবে তারা ইসলামী বীমাব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। ইসলামী ব্যাংকের মত ইসলামী বীমা তার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছে এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশ এর বিস্তৃতির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করলেও ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশে এর বিস্ময়কর অগ্রগতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং ইসলামে বীমা ব্যবস্থার মৌলভিত্তিসহ বাংলাদেশে এর বিস্তার সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করাই হবে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।]*

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, টংগী সরকারী কলেজ, টংগী, গাজীপুর।
** প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।

ইসলামে বীমা ব্যবস্থা

যে বীমা চুক্তি মানুষের জীবন সম্পর্কে করা হয় তাই জীবন বীমা। অর্থাৎ যে চুক্তির দ্বারা বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা তার জীবনের উপর কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাই জীবন বীমা।[১] বর্তমানে ইংরেজীতে Insurance ও বাংলায় 'বীমা'র আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে 'তাকাফুল' ব্যবহৃত হচ্ছে।[২] 'তাকাফুল' শব্দটি বীমার অধিকতর গ্রহণযোগ্য শব্দ না পাওয়ার কারণে সমার্থকরূপেও ব্যবহৃত হয়। [৩] তাকাফুল বলতে যৌথ জামানত বুঝানো হয়।[৪]

ইসলামী বীমাব্যবস্থার জন্য তিনটি পরিভাষার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: আত-তা'মীন আল-ইসলামী বা ইসলামী বীমা, আত-তামীন আত-তাকাফুল বা তাকাফুল বীমা এবং আত-তামীন আত-তাওয়াউনী বা সহযোগিতামূলক বীমা। শব্দগত পার্থক্য থাকলেও মর্মগতভাবে এগুলো এক ও অভিন্নার্থবোধক। যেমন, তা'মীন শব্দের অর্থ হচ্ছে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-যাকে সাধারণত বলা হয় বীমা। আর তাকাফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে, পরস্পরের জামিন হওয়া; যৌথভাবে দায়বদ্ধ হওয়া; সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। আর তা'আউন শব্দের অর্থ হচ্ছে, পারস্পরিক সহযোগিতা।[৫]

বর্তমানে আত-তাকাফুল নামক ইসলামী মতবাদটি ইসলামী বীমায় গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ শরীয়ত সম্মত এই মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা যাতে একজনের বিপদের সময় অন্যরাও ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। একটি দলের সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করার অথবা পারস্পরিক জিম্মাদারী নেয়ার কাজকেই তাকাফুল বলা হয়। একাধিক ব্যক্তি বা গোত্রের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও সাহায্য চুক্তিকেও তাকাফুল বলা হয়। এই সহযোগিতা একাধিক ব্যক্তি বা গোত্রের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে হতে পারে, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা মুকাবেলার ক্ষেত্রেও হতে পারে। আরবী শব্দ 'তাকাফুল'-এর অর্থ হল সমবায়, সংহতি বা ঐক্য।[৬]

ইকরাম শাকিরের মতে, An alternative to the concept of insurance is the Islamic doctrine of al-Takaful, as adopted by the Islamic

---

[১] এম. সোহরাব আলী, *জীবন বীমা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : কসমোপল পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ১৫
[২] এম তাজুল ইসলাম, *ইসলামী বীমাব্যবস্থা*, ঢাকা : প্রিয় প্রাঙ্গণ, ১৯৯৯, পৃ. ২
[৩] এ. জেড. এম শামসুল আলম, *ইসলামী ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল)*, ঢাকা : মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ২১
[৪] এম তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
[৫] ড. রুহী বাআল বাক্কী, *আল মাওরিদ*, বৈরূত : দারুল-ইলম আল-মালাঈন, ২০০৭, পৃ. ৩৫৮
[৬] এ. জেড. এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

insurance operators of today. This is because insurance may have a place in the Shariah if it is approved by the Shariah practiced based on shared responsibility, mutual co-operation and solidarity.[৭]

অর্থনৈতিক দিক থেকে তাকাফুলের অর্থ হচ্ছে, "Mutual provided by a group of people living in the same society against a defined risk on catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable thing. Hence, a Takaful is better known as a co-operative insurance."[৮]

মোটের উপর তাকাফুলের অন্তর্নিহিত ধারণা হচ্ছে, কোনো দল ও সমষ্টির কোনো সদস্যকে বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত বা রক্ষা করার জন্য উক্ত দল বা সমষ্টির অন্যান্য সদস্যদের অঙ্গীকার। দলের সদস্যগণ পরস্পরের মধ্যে এই অঙ্গীকার করে যে, যদি কোনো সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে অন্য সদস্য অর্থ দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে তার ক্ষতিপূরণ করবে। ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে এর অন্তর্নিহিত মূলমন্ত্র হচ্ছে, সবার মধ্যে সমতা আনয়ন করা। তাকাফুলের মৌলিক চরিত্র হচ্ছে, এ চুক্তি সমবায়, পরস্পর সহযোগিতা, দায়িত্ব ও সুবিধার সমবন্টন নিশ্চিত করে। একই সাথে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সবার কাছে সবকিছুর স্বচ্ছতা থাকে।

ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইলী বলেন, "ইসলামী তাকাফুল বা বীমা হচ্ছে এমন একটি যৌথ চুক্তি, যা কিছু বিপত্তির দরুণ সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি বা লোকসান কাটিয়ে ওঠার নিমিত্তে সমজাতীয় ঝুঁকির আশঙ্কাকারী একদল লোক নিজেদের মধ্যে নিষ্পন্ন করে থাকেন। এর পদ্ধতি হচ্ছে, অংশগ্রহণকারী দলের সকল সদস্য চাঁদা প্রদান করে একটি স্বতন্ত্র আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন বীমা/ক্ষতিপূরণ তহবিল গড়ে তোলেন। অতঃপর দলের কেউ যদি তাকাফুল সনদে বর্ণিত কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলে উক্ত ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে তার ক্ষতিপূরণ বা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বীমা সনদধারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা কিংবা স্বতন্ত্র কোনো কোম্পানী এবং বীমা কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে পারিশ্রমিক/বিনিময় গ্রহণ করে। তদ্রূপ সে

৭. Ikrame Shakir, *Tomorrows Takaful Products,* Dhaka : New Harizan, 1977.

৮. Dr. Maasum Billah, *Insuranec : A Comparative Legal Analysis of the Common Law, Principles & the Islamic Legal Thoughts,* Malayasia : Type script of thesis-IIV, 1997, p. 26.

তহবিলের পুঁজি বিনিয়োগ করেও ওয়াকিল বা মুদারিব হিসেবে লাভের নির্ধারিত অংশ বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে।"[৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে সমবায় বা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি বীমা

সমকালীন শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ, ফিকহী সংস্থা, একাডেমী ও গবেষণা কেন্দ্রগুলো নীতিগতভাবে সুদ ও অন্যান্য শরীয়ত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা না করার শর্তে সমবায় বা সহযোগিতাভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে।[১০] একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সমবায়, তা'আউন বা তাকাফুল বীমার ধারণা মূলত তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হচ্ছে : (ক) নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাঙ্খা, (খ) ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা এবং (গ) আগাম সতর্কতা। এই তিনটি উপাদানই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এই তিনটি মৌলিক বিষয় ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম, সভ্যতা ও আইন বিজ্ঞানে তার নজীর পাওয়া যায় না। নিম্নে এতদ্সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রমাণাদি তুলে ধরা হলো :

নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাঙ্খা বিষয়ক প্রমাণাদি

(১) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ মানুষের একটি স্বভাবজাত দাবি। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নিরাপত্তারূপী নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ "যেহেতু কুরায়েশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। অতএব তারা ইবাদত করুক এই ঘরের মালিকের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"[১১]

(২) হযরত ইবরাহীম আ. এর প্রার্থনা পবিত্র মক্কা নগরীর জন্য, رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করো, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করো।"[১২]

---

৯. ড. ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ আস সুবাইলী, *আত-তামীন আত তাকাফুলী মিন খিলালিল ওয়াকিফি*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., পৃ. ৪

১০. কুররা দাগী, *আত-তামীন আল ইসলামী, দিরাসাতু ফিকহিয়্যাতু তা'সিলিয়্যাহ*, বৈরূত : দারুল মাআরিফ, ২০০১, পৃ. ১৯৯

১১. আল-কুরআন, ১০৬ : ১-৪

১২. আল-কুরআন, ২ : ১২৬

(৩) মহানবী স. বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে নিরাপদে নিজ বাড়িতে রাত যাপন করতে পারে, যার কাছে দিনের প্রয়োজন মেটানোর মত খাদ্য-পানীয় রয়েছে, পুরো দুনিয়া যেন তার কাছে ধরা দিয়েছে।"[১৩]

ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা

ইসলামী বীমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাস্তবতার নিরিখে ব্যষ্টির বোঝা লাঘবে সামষ্টিক অংশগ্রহণ। অল্প সংখ্যকের আর্থিক ক্ষতি অনেকের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরণ করা। তাই এর সাথে শরীয়তের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং তা শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি উপাদান হিসেবে পরিগণিত। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।"[১৪] এ নির্দেশ যেহেতু সাধারণ ভাবধারাসম্পন্ন ও ব্যাপকার্থবোধক, তাই বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি বীমার অনুদান-তহবিল থেকে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যুক্তিসংগত। নবী করীম স. বলেন, "যে মুসলমান ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ।"[১৫]

আবূ মূসা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, "আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনদের খাদ্যশস্য কমে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার ও আমি তাদের।"[১৬]

---

[১৩] ইমাম ইবন মাযাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : আল-কনাআহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ২৭২৯, হাদীস নং-৪১৪১।

عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في يربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا

[১৪] আল-কুরআন, ৫ : ২

[১৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আল-ইসতিকরাদ ওয়া আদাইদ দুয়ুন ...., অনুচ্ছেদ : আস-সলাতু আলা মান তারাকা দাইনান, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং-২৩৯৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

[১৬] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায় : ফাযাইলুস সাহাবাহ, অনুচ্ছেদ : মিন ফাযাইলিল আশআরিয়্যিনা রাযিয়াল্লাহু আনহুম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১১১৭, হাদীস নং-৬৪০৮

প্রখ্যাত ফকীহ নাসির আব্দুল হামীদ বলেন, এ হাদীসটি এমন সব লোকের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও সাহায্য-সহযোগিতার জীবন্ত নমুনা যাদের আর্থিক সঙ্গতি সমপর্যায়ের নয়। কারো সঙ্গতি অধিক, কারো কম, কারো আবার কোনো সঙ্গতিই নেই। এর দ্বারা একটি শরঈ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূলকথা হলো, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে এমন কিছু বিষয় ছাড় দেয়া হয়, যা বিনিময় ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের মধ্যে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। যেমনটি এখানে লক্ষ্য করা যায়। কেউ তাদের মধ্যে বেশি অর্থ দিয়েছে, কেউ আবার কম দিয়েছে। প্রত্যেকেই তার সামর্থ্যানুযায়ী দিয়েছে। কিন্তু নেয়ার সময় সবাই সমানই নিয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, যে কম দিয়েছে, সে যা দিয়েছে তার তুলনায় বেশি নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও এখানে প্রতারণা, অস্পষ্টতা বা জুয়ার বৈশিষ্ট্যমুক্ত। কারণ পুণ্যসাধন ও পারস্পরিক সহযোগিতাই হলো এর একমাত্র উদ্দেশ্য।[১৭]

ইসলামী জীবন বীমা ইয়াতিমদের ভবিষ্যতের বস্তুগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। মহানবী স. ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বলেন, "আমি ও ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধান ও সাহায্যকারী ব্যক্তি এভাবে (তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রে করে দেখালেন) বেহেশতে থাকবো।"[১৮]

তিনি আরো বলেন, "পরস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি অভিন্ন দেহের মত যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে বাকী অঙ্গগুলো তার সাথে অনিদ্রা ও কষ্ট ভাগাভাগি করে নেয়।"[১৯]

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ ».

১৭. বি.এম. মফিজুর রহমান আল-আযহারী, *ইসলামী বীমার শারঈ ভিত্তি*, দাওয়াহ্ স্টুডেন্টস জার্নাল, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ২০০৯, পৃ. ৬৪

১৮. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু মাই ইয়াউলা ইয়াতিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮, হাদীস নং-৬০০৫

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هكَذَا وقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

১৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : তারাহুমি মুমিনীনা ওয়া তা'আতুফিহিম ওয়া তা'আযুদিহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩০, হাদীস নং-৬৫৮৬

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »

মোটকথা, বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের মাধ্যমে এবং বীমা গ্রহীতাদের সামান্য আর্থিক ত্যাগের বিনিময়ে ক্ষতিগ্রস্ত বীমা গ্রহীতাদের আর্থিক ক্ষতির প্রতিবিধান সম্ভব। এতে সামাজিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকবে, ব্যক্তি ও পরিবার লাভবান হবে এবং সর্বোপরি এর মাধ্যমে মানবিক সহযোগিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ইসলাম পুরো মানব সমাজকে একই পরিবারভুক্ত মনে করে।

আগাম সতর্কতা ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন

সম্ভাব্য আকস্মিক বিপদাপদ মোকাবিলা এবং জীবনের সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতি ও আগাম সতর্কতা অবলম্বনের জন্য যথাসম্ভব উপায়-উপকরণ সংগ্রহ এবং কর্মকৌশল নির্ধারণ ইসলামী শরীয়তের একটি স্বীকৃত ও অনুমোদিত বিষয়। ইসলাম মানুষকে ধ্বংস, বিপর্যয়, বিপদ-আপদ ও সম্ভাব্য যে কোনো অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা, সাবধানতা ও আত্মরক্ষার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। শরীয়তের সাধারণ নীতিমালা এবং কুরআন-সুন্নাহরে অসংখ্য বক্তব্যের আলোকে তা প্রমাণিত। আল্লাহ কাজকে কারণ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কর্মসাধনে উপায় অবলম্বন তথা কার্যকারণের এই পদ্ধতিকেই তাঁর সৃষ্টিলোক পরিচালনার নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং সমস্ত কার্যকারণের কার্যকারিতা বা ক্রিয়াশীলতা নিজের ক্ষমতাধীন করে রেখেছেন। তাই মুসাব্বাব (উদ্ভূত ঘটনা)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আসবাব (উপায়-উপকরণ) গ্রহণ করে তারই উপর ভরসা করে নিয়ে জীবন ধারনের প্রচেষ্টাই হলো মুমিন জীবনের কর্মপদ্ধতি। নিম্নে এ মর্মে কুরআন ও সুন্নাহরে প্রমাণাদি তুলে ধরা হলো :

আল-কুরআনের নির্দেশনা

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎ কাজ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।"[২০] এই আয়াতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে যে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা জীবনের যে কোনো ঝুঁকি ও দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে। তাকাফুল তেমনি একটা সতর্কতা।

তিনি আরো বলেন,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।"[২১]

---

[২০] আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

[২১] আল-কুরআন, ৪ : ৯

এই আয়াতের ভাবার্থ হলো, মাতাপিতার উচিত সন্তানদের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করা এবং তাদের একটি সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দেয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। আর বীমা সেই রকমই একটা চেষ্টামাত্র। সমস্ত নবী-রসূলের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও পূর্ব প্রতিরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

(ক) হযরত ইউসুফ আ. সাত বছরের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য সাত বছরের আগাম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক যে সঞ্চয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কুরআনুল কারীমে সূরা ইউসুফে তা উল্লেখপূর্বক আমাদেরকেও ইউসুফী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ
"ইউসুফ বললো, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষবাদ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষসহ রেখে দিবে।"[২২]

(খ) মহাপ্লাবনের ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে আত্মরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ নূহ আ. কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, أن اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا
"তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ করো।"[২৩]

আস্-সুন্নাহর নির্দেশনা

ভবিষ্যত বংশধরদের অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে পরিবার প্রধানের অবর্তমানে পোষ্যদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা মহানবীর স. নির্দেশনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ স. আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমি বললাম, আমি তো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং আমি একজন ধনীলোক। একটি মাত্র কন্যা সন্তানই আমার ওয়ারিস। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করবো? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক পরিমাণ? তিনি বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ, অবশ্য এক-তৃতীয়াংশও অধিক হয়ে যায়। তুমি তোমার ওয়ারিসকে মানুষের কাছে হাত পাতার মতো দুরবস্থায় রেখে যাবার পরিবর্তে ধনবান রেখে যাওয়া উত্তম।"[২৪]

---

[২২] আল-কুরআন, ১২ : ৪৭

[২৩] আল-কুরআন, ২৩ : ২৭

[২৪] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : রিছাইন-নাবিয়্যি স. সাদ ইবন খাওলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১, হাদীস নং-১২৯৫

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي
عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا

মূলত তাকাফুল একটি আগাম সতর্কতা ও বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বনের চেষ্টা মাত্র যা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপূরক উপাদান এবং ঈমানের অনিবার্য দাবি। পক্ষান্তরে কোনো প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা, উপায়-উপকরণ এবং বস্তুগত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ না করে শুধু তাওয়াক্কুলের দোহাই দেয়া ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কুরআনের শিক্ষা, রসূলুল্লাহ স.এর বাস্তব আদর্শ, সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফগণের কর্মধারার মধ্যে এর উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন-

আনাস রা. বলেন, "এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি সেটি (উট) বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করবো, না তা বন্ধনমুক্ত রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করবো? তিনি বললেন, তুমি সেটি বেঁধে রাখো এবং (আল্লাহর উপর) ভরসা করো।"[২৫]

তাকাফুল বা বীমার বৈধতার অন্যান্য দলীল

বর্তমান বীমা ব্যবস্থার পূর্বে ইসলামের বিভিন্ন যুগে, বিশেষ করে রসূলুল্লাহ স. ও খুলাফা-ই-রাশিদীনের সময়কালে, এমনকি নবুওয়াতপূর্ব যুগেও এরকম কিছু আর্থ-সামাজিক বিধিবিধান লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো বীমার আধুনিক রূপরেখার সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই ইসলামী শরীয়ত 'আল-কিয়াস' পদ্ধতি অনুসরণ করেও বীমার বৈধতা প্রমাণ করা সম্ভব। বীমা পদ্ধতিকেই সরাসরি ঐসব পদ্ধতির কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার কথাও অনেকে বলেছেন। যেমন-

আল-কাসামাহ : কোনো জনপদে যদি কেউ নিহত হয় আর তার হত্যাকারীকে শনাক্ত করা না যায়, তাহলে সে জনপদের পঞ্চাশজন ব্যক্তি, যাদেরকে নির্বাচন করবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক, এ মর্মে পৃথক পৃথকভাবে শপথ করবে যে, আল্লাহর কসম! আমি হত্যা করিনি। কে হত্যা করেছে তাও জানি না। অতঃপর তারা সামষ্টিকভাবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে রক্তপণ পরিশোধ করবে।[২৬]

পথের ঝুঁকির জিম্মাদারী : কেউ যদি কাউকে বলে, (এটি নিরাপদ পথ) তুমি এই পথে যাও। কেউ যদি তোমার মালামাল ছিনিয়ে নেয়, তাহলে আমি তার জিম্মাদার।

لبَنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

২৫. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কিয়ামাহ, অনুচ্ছেদ : হাদীস আকিলহা ওয়া তাওয়াক্কাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০৫

عن انس بن مالك يقول قال رجل يارسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل.

২৬. বি এম মফিজুর রহমান আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

আমি তোমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে তার জন্য প্রথম ব্যক্তি দায়ী থাকবে। এখানে مضمون عنه অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের চুক্তি বৈধ। শায়খ আলী আল-খাফীফ বলেন, এটি (বীমা) একটি অভিনব আর্থিক লেনদেন। এর পক্ষে বা বিপক্ষে শরী'য়তের কোন সরাসরি বক্তব্য নেই। এ ধরনের যে কোনো বিষয়ে মৌলিক অবস্থা হলো বৈধতা।[২৭]

আল্লামা মুহাম্মদ বিলতাজী বলেন, "বীমা ব্যবস্থা যাকাত, সাদাকাত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের উপর অর্পিত আর্থিক দায়-দায়িত্বভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকল্প কিছু নয়, বরং এটি ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থারই একটি অংশ, যা সময়ের পরিবর্তনে আজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এটি অনিবার্য দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ নীতি শরী'য়তে স্বীকৃত হয়েছে : "জনকল্যাণ বিষয়টি পরিবর্তনশীল এবং এর কোনো চূড়ান্ত সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না"।[২৮]

কিন্তু তা লাভ-লোকসানের চুক্তিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং মুনাফার তাকাফুল বীমা ব্যবস্থায় যে প্রিমিয়াম প্রদান করা হয় সেই প্রিমিয়ামের অর্থ বীমা প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করেন। মূলত তা এই স্কীমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রদত্ত অর্থের জিম্মাদার বা ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করেন।[২৯] ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হলে বীমা ক্রয়কারীর নিকট থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তা লাভ-লোকসানের চুক্তিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং মুনাফার তার একটি নির্দিষ্ট লভ্যাংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানও পায়।[৩০] এ বিষয়টি বিবেচনায় আনা হলে দেখা যায় যে, তাকাফুল বীমার অংশগ্রহণকারী এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা একটি অংশীদারিত্বের চুক্তি, যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় মুদারাবা।[৩১]

প্রচলিত বীমায় যে দু'টি মৌলিক নীতি বৈধ চুক্তির জন্য অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়, তাকাফুলের ক্ষেত্রেও সেই নীতি দু'টি একইভাবে প্রযোজ্য। কেননা বীমাযোগ্য স্বার্থনীতি পালিত হওয়ার ফলে বীমাব্যবস্থা ফটকাবাজী চুক্তি বা জুয়ার অনুরূপ নয়। একইভাবে চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি জীবন বীমা পদ্ধতিকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ঝুঁকি

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. ইমাম কারাফী, *আল-ফুরুক*, বৈরূত : দারুল ইলম, ২০০১, পৃ. ৮

ان مصالح الناس تتجدد ولاتنتهى

২৯. K. M. Mortuza Ali, *'Insurance in Islam' Some Aspect of Islamic Insurance*, Dhaka : Islamic Takaful Company Ltd., 1991, p. 54.

৩০. কে. এম. মুর্তুজা আলী, ইসলামী বীমার আইনগত সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান, *জাতীয় সেমিনার স্মারক*, ২০০২, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ, পৃ. ২৩

৩১. প্রাগুক্ত

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। অতএব মুদারাবাভিত্তিক তাকাফুল চুক্তির ক্ষেত্রেও বীমাযোগ্য স্বার্থ এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তবে বীমাযোগ্য স্বার্থের কারণে মনোনীত ব্যক্তি এককভাবে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার রাখেন এবং তাকাফুল ব্যবস্থায় প্রদত্ত চাঁদা বাজেয়াপ্ত করা হয় না।[৩২]

তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে, স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য নীতি ও পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। তাকাফুল একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা যা শরীয়তের আইন অনুসারে পরিচালিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোক্তাগণ অঙ্গীকারাবদ্ধ। অতএব, শরীয়ত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো বিধি-বিধান তাকাফুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তা চূড়ান্ত সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে চুক্তি করা হয়েছে তার লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে।[৩৩]

সর্বোপরি বলা যায়, তাকাফুল বা ইসলামী বীমা এমন এক ধরনের ইবাদত বা তৎপরতা যার মূলনীতি হলো সাধারণভাবে ইবাদতের ইসলামী আদর্শ এবং তার মাধ্যমে সৎকর্ম ও খোদাভীতি অর্জনের প্রয়াস চালানো। ইসলামে বীমা ব্যবস্থার সামগ্রিক ধারণায় এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য সৎকর্ম ও খোদাভীতি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে সহায়তা করার ইলাহী ধারণার উপর তাকাফুল সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিশীল। তাকাফুলে যে ব্যবসা বা বাণিজ্যিক উপাদান আছে তার সব কিছুই সম্পাদন করতে হবে ইলাহী নীতির আলোকে।[৩৪]

ইসলামে বীমা ব্যবস্থার মৌলভিত্তি

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এর কার্যক্রম পূর্ব প্রচলিত, ইসলামে স্বীকৃত মোট চার ধরনের চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩৫]

তাবারুরু চুক্তি (বীমা গ্রহীতা ও বীমায় সংগৃহীত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক)

যে চুক্তির মাধ্যমে বীমায় অংশগ্রহণকারী ও বীমা তহবিলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, সেটি হচ্ছে মূলত তাবাররু চুক্তি। মূলত তাবাররু'ই হচ্ছে ইসলামী বীমার মূল বুনিয়াদ। এ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানা চুক্তি দু'প্রকার: (১) বিনিময়ভিত্তিক চুক্তি ও (২) অনুদান চুক্তি । বিনিময় চুক্তি হচ্ছে, "যে চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে যা প্রদান করে তার বিপরীতে বিনিময়

---

[৩২] কে. এম. মুর্তুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৩৩] প্রাগুক্ত

[৩৪] আব্দুর রকীব, ইসলামী বীমা : প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, *ইসলামী ব্যাংকিং*, বর্ষ-৬, সংখ্যা-৩-৪, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৭০

[৩৫] কুররা দাগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

গ্রহণ করে থাকে"।[৩৬] যেমন: সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মুদারাবাহ ইত্যাদি জাতীয় চুক্তি। আর অনুদান চুক্তি হচ্ছে, 'যে চুক্তি অনুযায়ী এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত, শুধু দানের নিয়াতে কোনো সম্পদ বা অধিকারের মালিকানা বা স্বত্ব সম্প্রদান করা হয়, তাই তাবাররু' চুক্তি'। যেমন: হিবা, ওয়াসিয়াত, সাদাকাহ, 'আরায়াহ চুক্তি ইত্যাদি। বিনিময় চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব শরীয়ত পরিপন্থী বিষয় থেকে মুক্ত থাকার শর্তারোপ করা হয়, তন্মধ্যে রয়েছে : (ক) সর্বপ্রকার সুদী কর্মকাণ্ড, (খ) *আল-গারার* তথা অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা, প্রতারণা এবং (গ) আলমাইসির বা জুয়া।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা বিনিময় চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাতে এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে, তাই মুসলিম ফকীহগণ একে অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন।

আকিলাহ পদ্ধতি

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে *আল-আকিলাহ* পদ্ধতি তৎকালীন আরব সমাজে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা হিসেবে কার্যকর ছিলো। এই প্রথা অনুযায়ী এক গোত্রের কোনো লোক যদি অপর গোত্রের কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে হত্যাকারীর নিকটাত্মীয় ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে দিয়াত বা রক্তমূল্য পরিশোধ করতো। হত্যাকারীর এ নিকটাত্মীয়বর্গকে বলা হতো *'আকিলাহ'*। মতান্তরে আসাবাহ বা হত্যাকারীর পিতৃসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়বর্গকেই 'আকিলাহ' বলা হতো।

পরবর্তীতে মহানবী স. অনিচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে হত্যার দিয়াতের ক্ষেত্রে এই 'আকিলাহ' পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সমষ্টির উপর অর্পণ করেন। যেমন: হুযাইল গোত্রের এক মহিলার খুনের রায় প্রদানকালে মহানবী স. স্বয়ং 'আকিলাহ'র ধারণা গ্রহণ করেন।[৩৭]

---

৩৬. ড. আব্দুল ওয়াহিদ কারাম, *মুজামুল মুসতালাহাতুল কানূনিয়াহ*, আল-কাহেরা : দারুন নাহদা আল-আরাবিয়া, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৬

৩৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : জানীনুল মারতাতু....., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬, হাদীস নং-৬৯১০

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

আবু হুরায়রা রা. বলেন, "একদা হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা বিবাদকালে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলে সে তার গর্ভের শিশুসহ নিহত হয়। নিহতের উত্তরাধিকারীরা রসূলুল্লাহ স. এর নিকট এর প্রতিকার দাবি জানালে তিনি এই রায় প্রদান করেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের জন্য একজন দাস এবং আকিলা (পিতৃকুলের নিকটাত্মীয়বর্গ) রীতি

মুওয়ালাহ চুক্তি

মুওয়ালাহ চুক্তি হচ্ছে, "এ মর্মে দু'ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি যে, তাদের কেউ যদি দিয়াতযোগ্য অপরাধ করে, তাহলে অন্যজন তার রক্তপণ দেবে এবং মৃত্যুর পর তারা একজন আরেকজনের উত্তরাধিকারী হবে"।[৩৮] জাহিলিয়া যুগে এ ধরনের চুক্তি প্রচলিত ছিলো। পরবর্তীতে ইসলামেও এর স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটিই হচ্ছে ইবন আব্বাস রা., ইবন মাসউদ রা. এবং হানাফী মাযহাবের অভিমত। অবশ্য কোনো কোনো গবেষক মুওয়ালাহ চুক্তির উপর বীমাব্যবস্থার ভিত্তি রচনার এই প্রয়াসের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। কারণ, মুওয়ালাহ চুক্তি ইসলামী আইনবেত্তাগণের কাছে সর্বজন স্বীকৃত নয়। অথচ কিয়াসের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আসল বা মাকীস আলাইহি (مقيس عليه) সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য হবে।

বাধ্যতামূলক দান

এটি মালিকী মাযহাবের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাত্তাব বলেন, বাধ্যতামূলক দান হচ্ছে, "নিঃশর্তভাবে নিজের উপর নিজেই জনকল্যাণমূলক দায়ভার গ্রহণ করা। এর মধ্যে সাদাকাহ, হিবাহ, ওয়াকফ, আরীয়াহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত"।[৩৯] ইমাম মালিক র. বলেন, "কাফালাহ (কারো প্রতিভূ/জামিন হওয়া) হচ্ছে একটি জনকল্যাণমূলক কাজ। আর কেউ যদি কোনো মা'রূফ বা জনকল্যাণকর কাজ নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়, তবে তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।"[৪০]

সমবায়ভিত্তিক ইসলামী বীমা একটি জনকল্যাণমূলক চুক্তি। কারণ এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা বা ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারেন। এ ব্যাপারে বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে একটি সমঝোতা হয়ে থাকে।

অনুযায়ী নিহত মহিলার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে"। আর্থিক লেনদেনের এ নিয়ম বীমা কোম্পানীকে প্রদেয় প্রিমিয়াম প্রদানের সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষতিপূরণের দিক থেকে আকিলার কার্যকারিতা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় পদ্ধতির মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির লোকসানের বোঝা একদল লোক পরস্পরের মাঝে ভাগ করে নেয়ার রীতি স্বীকৃত। আবার অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার মোকাবেলায় উভয় পদ্ধতি ছিল ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ স্বরূপ। ফলে এ আকিলাহ পদ্ধতিকে বর্তমান বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যেতে পারে। -বি.এম. মফিজুর রহমান আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩৮] জাকারিয়া আল-বাররি, *আল-ওয়াসীত ফী আহকামিত তারাকাত ওয়াল মাওয়ারীছ*, আল-কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৯৭৭, খ. ৫, পৃ. ৫০

[৩৯] ইমাম হাত্তাব, *তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতিজাম*, আল-কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৩৭৮, পৃ. ২১৭

[৪০] ইমাম মালিক, *আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা*, আল-কাহেরা : ১৩৭৮ হি., পৃ. ....

বীমাগ্রহীতা যেহেতু এ চুক্তি অনুযায়ী বীমাফান্ডে দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন, তাই এটি তার জন্য বাধ্যতামূলক দান হিসেবে পরিগণিত হবে।

ওয়াক্ফ

বীমা পলিসিহোল্ডার নিজের অর্থ দিয়েই নিজে উপকৃত হচ্ছেন, তা সত্ত্বেও কী করে এখানে তাবাররু' সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সমকালীন অনেক গবেষক বলেছেন, আসলে এটি হচ্ছে এক প্রকার ওয়াক্ফভিত্তিক তাবাররু পদ্ধতি, যেখানে ওয়াকফকারী নিজে ও তার সন্তানাদি কর্তৃক ওয়াকফকৃত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার শর্ত আরোপ করতে পারেন। এর দ্বারা ওয়াক্ফ তার তাবারুর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে না, বরং ওয়াক্ফ ও শর্ত দু'টোই শুদ্ধ। এটিই হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া।[৪১] এ মতের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণও আছে। যেমন:

(ক) নবী করীম স. এর বাণী: "যে ব্যক্তি রুমা কূপটি ক্রয় করে তাতে নিজের ও অন্যান্য মুসলমানদের বালতি ফেলার ব্যবস্থা করবে (অর্থাৎ এটি আল্লাহর পথে দান করে নিজেও উপকৃত হবে, অন্যদেরকেও উপকৃত করবে), তাকে জান্নাতে এর চেয়ে অতি উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর উসমান রা. সেটি ক্রয় করলেন।"[৪২]

(খ) উমর রা. তাঁর ভূমি ওয়াক্ফ করার সময় বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি এর দেখাশুনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে, সে এর থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা খাবে, তাতে কোনো অপরাধ নেই।"[৪৩] বাস্তবে এই ওয়াকফকৃত ভূমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিলো।

তাবাররু ও মু'আদা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত তা'আউনী চুক্তি

সমকালীন গবেষকদের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, বীমা ফান্ডকে ওয়াক্ফ-নীতির আওতাভুক্ত বা অন্য যে কোনো আকারে এর আইনগত ভিত্তি রচনা করা হোক না কেন, মূল তাকাফুল চুক্তিটিকে নিছক তাবাররু' হিসেবে গণ্য করাটা বিধিসম্মত নয়। কারণ এতে বীমাগ্রহীতা বীমা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে প্রথমেই যেটা চিন্তা করে সেটি হচ্ছে নিজের উপকার, (ঝুঁকি বা দুর্ঘটনা থেকে) আত্মরক্ষা বা আর্থিক নিরাপত্তা

---

[৪১] আল্লামা কাসানী, *আল-বাদায়ইউস সানাঈ*, আল-কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৩৭৮ হি., খ. ৬, পৃ. ২২০

[৪২] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : মান রা'আ সাদাকাতাল-মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

قَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

[৪৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-ওসায়া, অনুচ্ছেদ : ওমা লিল-অসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

লাভের নিশ্চয়তা। অন্য গ্রাহকদের উপকার ও সহযোগিতা করার চিন্তা যদিও থাকে, সেটি আসলে অনেকটা প্রান্তিক, গৌণ ও অমৌলিক। এটা তার মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, *তাবাররু'* চুক্তির ক্ষেত্রে দাতার মূল উদ্দেশ্য থাকে অন্যকে সাহায্য করা। আর যদি সে নিজে এর দ্বারা উপকৃত হয়, সেটি থাকে গৌণ বা প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুগত। তাই আসলে তাকাফুল চুক্তিটি নিছক তাবাররু' চুক্তি বা নিছক মু'আদাহ চুক্তি কোনটিই নয়। বরং এটি হচ্ছে এমন একটি তা'আউন বা সমবায় চুক্তি যার মধ্যে তাবাররু' ও মু'আদাহ উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর সহযোগিতামূলক চুক্তি হচ্ছে, কোনো যৌথ স্বার্থ বা কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে দু'ব্যক্তির মধ্যকার চুক্তি।

এই অভিমত অনুসারে ইসলামী জীবন বীমার চুক্তিগত নাম হবে, আকদুত্ তাআউনী বা পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি, যার মধ্যে আকদুল মুআওয়াদাহ বা বিনিময় চুক্তি এবং *আকদুত তাবাররু* বা অনুদান চুক্তি উভয়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

ওয়াকালাহ চুক্তি বা বীমা কোম্পানী ও বীমাগ্রহীতাদের মধ্যে সম্পর্ক

যে চুক্তির মাধ্যমে বীমা কোম্পানী (ওয়াকীল) বা বীমাচুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের (মুওয়াক্কিল) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটি হচ্ছে ওয়াকালাহ চুক্তি। এটি পারিশ্রমিকের বিনিময় হতে পারে, আবার বিনিময় ছাড়াও হতে পারে। এই চুক্তির ভিত্তিতেই বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাগ্রহীতাদের প্রতিনিধি হিসেবে বীমার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মুদারাবাহ চুক্তি (বীমা কোম্পানী ও বীমাগ্রহীতাদের থেকে সংগৃহীত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক)

যে চুক্তির মাধ্যমে বীমা কোম্পানী ও বীমা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটিই হচ্ছে মুদারাবাহ ধরনের চুক্তি। এতে কোম্পানী (মুদারিব) পলিসি হোল্ডারদের প্রদত্ত কিস্তি থেকে সংগৃহীত অর্থ মুদারাবাহ নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে এবং অর্জিত মুনাফা শরীয়তসম্মত চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়।

মুশারাকাহ চুক্তি (বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক)

বীমা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের বা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় যে চুক্তির মাধ্যমে, তাই হচ্ছে মুশারাকাহ বা অংশীদারিত্ব চুক্তি। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় এই প্রকার শিরকাতকে 'শিরকাতুল আকদ্' নামকরণ করা হয়। শিরকাতুল আকদ হচ্ছে, মূলধন ও মুনাফা উভয় ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের চুক্তি। এটিকে শিরকাতুল ইনানও বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক পরিভাষায় একে 'লিমিটেড কোম্পানী' বলা হয়।

বিশ্বে বীমাব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ সত্ত্বেও ইসলামী চিন্তাবিদ বা আলিমদের মধ্যে বীমা ব্যবস্থার বৈধতা প্রশ্নে এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত রয়েছে। এসব ইসলামী চিন্তাবিদ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। প্রথম গ্রুপটি বীমাব্যবস্থা এবং ধারণার সাথে পুরোপুরি একমত। দ্বিতীয় গ্রুপ সাধারণ বীমাব্যবস্থার ধারণাটি গ্রহণ করলেও জীবন বীমাব্যবস্থাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর তৃতীয় গ্রুপটি বীমাব্যবস্থার পুরো ধারণাটিই প্রত্যাখ্যান করেছে এই যুক্তিতে যে, এটা শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার ধারা ও বাংলাদেশ

মুসলিম দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ও পরিবর্তিত বীমা ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বীমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু আছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয় পরিপূরক হিসেবে তারা ইসলামী বীমা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। কারণ তাদের বীমা ব্যবসা ইসলামী বীমার উপর অর্পণ করা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং পুরোপুরি শরীয়তভিত্তিক হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের মত ইসলামী বীমা তার গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা প্রমাণ করেছে এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশে এর বিস্তৃতির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সত্তরের দশকে সুদানে তাকাফুলের প্রথম যাত্রা শুরু হয় এবং এরপর তা প্রতিষ্ঠিত হয় সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও লুক্সেমবার্গে। জেদ্দা, বাহরাইন ও লন্ডনে রি-তাকাফুল বা পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী বীমা শুরু হয় কাতার, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই ও সিঙ্গাপুরে। ইসলামী বীমার বিকাশ ও অগ্রগতিতে মালয়েশিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং দেশের অভ্যন্তরে ও মুসলিম দেশসমূহে তার প্রসারে সচেষ্ট হয়। কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহের শতকরা ৫ ভাগ লোক ইসলামী বীমা গ্রহণ করেছে। মালয়েশিয়ায় এই হার শতকরা ২৭ ভাগ। ইসলামী বীমার বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সুযোগ অনেক এবং সম্ভাবনা ব্যাপক। ইসলামী বীমার প্রিমিয়াম আয় এশিয়ার দেশসমূহে ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সারা বিশ্বে এর পরিমাণ ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৪] আরব পুনঃবীমা গ্রুপ ২০১০ সালের মধ্যে শুধু সাধারণ খাতে এর আকর্ষণীয় অগ্রগতি ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে পরিকল্পনা করেছে। মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের উন্নয়নে ৮০

---

৪৪. ড. মোহা. মাসুম বিল্লাহ, অনু. মির্জা ওয়ালি উল্লাহ, বাস্তবতার আলোকে ইসলামী জীবনবীমার রূপরেখা, *জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা,* ২০০২, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, পৃ. ২৩

মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধিত মূলধনে ইসলামী রি-তাকাফুল বা পুনঃবীমা গঠন করা হয়েছে।[৪৫]

বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও ইসলামী বীমার সূচনা হয় ১৯৯৮ সালে। সে বছর ইসলামী কর্মাশিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ও ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড নামক দু'টি বীমা কোম্পানী ইসলামী বীমা ব্যবসার অনুমতি লাভ করে। ২০০০ সালে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ২০০১ সালে প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ইসলামী জীবন বীমা ব্যবসায় অনুমতি লাভ করে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বর্তমানে বেশ কয়েকটি প্রচলিত জীবন বীমা কোম্পানীর ইসলামী তাকাফুল প্রজেক্ট রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী তাকাফুলের প্রথম প্রয়াস এদেশে গ্রহণ করে হোমল্যাণ্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী। এরাই সুদী বীমার পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের প্রবর্তন করে এবং বিপুল সাড়া পায়।[৪৬] এরপর একে একে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ইসলামী কর্মাশিয়াল ইন্স্যিুরেন্স লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। এর নেপথ্যে দু'টি বিষয় সামগ্রিকভাবে কাজ করছে :

(এক) বাংলাদেশের বীমা ব্যবসার অগ্রগতি বিস্ময়কর। তবে তা ঘটেছে মাত্র গত দশকেই। স্বাধীনতা লাভের পরপরই এদেশের সকল বেসরকারী বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করে মাত্র দু'টি প্রতিষ্ঠান চালু করে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারী ব্যাংকগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণের পাশাপাশি যেমন বেসরকারি খাতেও ব্যাংক খোলার অনুমতি দেয়া হয় তেমনি বেসরকারি খাতে বীমা কোম্পানী সাধারণ ও জীবন বীমা উভয়ই প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। ইতোমধ্যে দেশের জনগণের কাছে, বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির বীমার প্রয়োজনও বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই একদিকে যেমন বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেমনি প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯১ সালে জীবন বীমা খাতে বার্ষিক প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। দশ বছর পর ২০০০ সালের শেষদিকে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০ কোটি টাকা হয়।

---

[৪৫] K. M. Mortuza Ali, ibid, p. 53.

[৪৬] Ibid, p. 54.

অর্থাৎ বৃদ্ধির হার + ৫০০%। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৯৯১ সালে ২০০ কোটি টাকা আর বর্তমানে তা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ + ১০০%। ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের ফলে সম্ভাবনাময় উক্ত খাতটিতে বিনিয়োগের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটছে।

(দুই) বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম। এই জনসংখ্যার বেশির ভাগই মনেপ্রাণে ইসলামী অনুশাসনের প্রত্যাশী। তাই তারা প্রচলিত সুদী বীমার বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বীমার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৪৭] আর ইসলামী বীমার এই যুগোপযোগী সম্প্রসারণের ফলে এর সাথে সম্পৃক্ত কোম্পানীগুলো কোটি কোটি টাকার প্রিমিয়াম সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে অন্যান্য দেশের মতো ইসলামী বীমা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর গতি আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং ইসলামী বীমা সম্পর্কে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সুস্পষ্ট বক্তব্য জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

[৪৭] শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও ইসলাম*, ঢাকা : গ্রন্থমেলা, ২০০৩, পৃ. ৯৬

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৪
এপ্রিল-জুন : ২০১৩

ইসলামী আইনে গর্ভপাত : একটি পর্যালোচনা

তারেক বিন আতিক*
শাহাদাৎ হুসাইন খান**

[**সারসংক্ষেপ** : *মানববংশ বৃদ্ধির একমাত্র পদ্ধতি হলো বৈধ উপায়ে নারী-পুরুষের যৌন মিলন। এর ফলে নারীর গর্ভে ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে আর গর্ভস্থ ভ্রূণের চূড়ান্ত বিকশিত রূপই হলো পূর্ণ মানবশিশু। তবে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন কারণে ভ্রূণ ধ্বংস করছে। আর ভ্রূণ ধ্বংসের বর্তমান প্রচলিত ধরন হলো গর্ভপাত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপ ও আমেরিকায় বেআইনী গর্ভপাত ব্যাপকতা লাভ করে, তবে প্রাচীন মিসর ও গ্রীসে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেক দেশে গর্ভপাত বৈধকরণ আইন চালু হয়। কোনো কোনো দেশে জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটানোর মতো বিষয়ও দেখতে পাওয়া যায়। সমকালীন প্রায়োগিক নীতিবিদ্যায় গর্ভপাত অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলেও এখন আর তা নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এ বিষয় নিয়ে সময়কালীন বিশ্বে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গর্ভপাতের বিপক্ষে আন্দোলনরত জীবনবাদী (Pro-life) এবং গর্ভপাতের পক্ষে আন্দোলনরত স্বাধীনতাবাদী (Pro-choice) দের বিপরীতমুখী অবস্থান খুবই স্পষ্ট। গর্ভপাত বিষয় আলোচনায় নারী স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে এসে যায়। গর্ভপাত বিষয়টি নিয়ে রাজনীতির অন্যতম পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের Pregnant Women Support Act । মুসলিম বিশ্বেও গর্ভপাত বিষয়টি খুব ব্যাপকভাবে আলোচিত। এ প্রবন্ধে গর্ভপাতের সংজ্ঞা, শরঈ বিধান, ফকীহগণের অভিমত, বৈধ-অবৈধর ক্ষেত্র, এর ক্ষতি ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনাকে সীমিত রাখা হয়েছে।*]

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
** গবেষণা সহকারী, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা।

গর্ভপাত-এর সংজ্ঞা

গর্ভ শব্দটি অভ্যন্তর, ভিতর, মধ্য, তলদেশ, উদর, জঠর, গর্ভাশয়, ভ্রূণ, জঠরস্থ সন্তান, উদরস্থ সন্তান[১] অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা[২] ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা অভিধানে গর্ভপাত অর্থ লেখা হয়েছে, অসময়ে বা অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভচ্যুতি বা গর্ভ থেকে নিঃসরণ, গর্ভস্রাব, ভ্রূণ হত্যা।[৩] গর্ভপাতের সমার্থক বাংলা শব্দ হলো ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাতন, গর্ভোপঘাত, পেটখসা, পেটখসানো।[৪] ইংরেজীতে গর্ভপাত বুঝাতে Miscarriage ও Abortion শব্দদ্বয় বহুল ব্যবহৃত।[৫]

ইংরেজী অভিধানে Abortion অর্থ লেখা হয়েছে The expulsion of fetus prematurely, the defective result of a premature birth;[6] the deliberate ending of a pregnancy at an early stage; a medical operation to end a pregnancy at an early stage.[৭]

আরবী ভাষায় সাধারণত গর্ভপাত বুঝাতে ইজহায (اجهاض) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর শাব্দির অর্থ বিরত রাখা, পরাজিত করা, পরিত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা।[৮] যেমন বলা হয় : اجهضت المرأة اسقطت حملها -মহিলাটি গর্ভপাত করালো, সে তার গর্ভ বা ভ্রূণ ফেলে দিলো।[৯]

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৩৪৭; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ২৪৩

২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৮

৩. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৪. অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮, পৃ. ২০।

৫. Mohammad Ali and others, *Bangla Academy Bangla-English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1994, p.164; SAILENRRA BISWAS, *SAMSAD BENGALI ENGLISH DICTIONARY*, Calcutta : SHISHU SAHITYA SAMSAD PVT LTD., Third Edition, 2004, p. 301

৬. *THE NEW INTERNATIONAL WEBSTER'S POCKET DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE*, New Delhi : CBS Publishers and Dictributors, 2001 p. 2

৭. A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford : OXFORD UNIVERSITY PRESS, Eighth edition, 2010, p. 3

৮. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১৫৭

৯. *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ*, বৈরূত : দারুল মাশরিক, তা. বি., পৃ. ১০৮

আল-কুরআনুল কারীমে اجهاض শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তবে হাদীসের গ্রন্থসমূহে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।[১০]

---

১০. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ,* তাহকীক : শুয়াইব আল-আরনাউত ও অন্যান্য, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা. বি., হাদীস নং-১২৯৭৭, ২১৫১১, ২২৬৬০; আবুল হাসান আলী ইবনু উমার আদ-দারাকুতনী আল-বাগদাদী, *সুনানুদ দারাকুতনী,* তাহকীক : আস-সায়্যিদ আব্দুল্লাহ হাশিম ইয়ামানী আল-মাদানী, অধ্যায় : আস-সিয়াম, অনুচ্ছেদ : তুলুউশ শামসি বা'দাল ইফতার, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৩৮৬/১৯৬৬, খ. ২, পৃ. ২০৬, হাদীস নং ১০

عن بن عباس : أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت فأمرها بن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي هذا صحيح

আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : আল-আশরিবাতু ওয়াল হাদ্দু ফীহা, অনুচ্ছেদ : আশ-শারিবু ইউযরাবু যিয়াদাতান আলাল আরবাঈন, মক্কা মুকাররমা : মাকতাবাতু দারুল বায, তাহকীক : মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আতা, ১৪১৪ /১৯৯৪, খ. ৮, হাদীস নং- ১৭৩২৮

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَلَغَنَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ فَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْسِمَنَّهَا عَلَى قَوْمِكَ.

আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনু হিব্বান আত-তামীমী আল-কুসতী, *সহীহ ইবন হিব্বান,* অধ্যায় : আস-সিয়ার, অনুচ্ছেদ : আল-গানাইম ওয়া কিসমাতুহা, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪/১৯৯৩, তাহকীক : শুয়াইব আল-আরনাউত, খ. ১১, হাদীস নং- ৪৮৩৬; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : মুসনাদুল মুকছিরীন মিনাস সাহাবাহ, অনুচ্ছেদ : মুসনাদ আনাস ইবন মালিক রা., আল-কাহেরা : মু'আসসাসাতুল কুরতুবাহ, তা. বি., খ. ৩, হাদীস নং- ১৩০০০

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين (من قتل كافرا فله سلبه) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم قال أبو قتادة : يا رسول الله ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأجهضت عنه فقال رجل أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها وكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت فسكت صلى الله عليه و سلم فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : والله لا يفيئها الله على أسد من أسده و يعطيكها فضحك النبي صلى الله عليه و سلم وقال : (صدق عمر) إسناده صحيح على شرط مسلم

আবুল ফযল আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী আশ-শাফিঈ, *ফাতহুল বারী,* অনুচ্ছেদ : গাযওয়াতু উহুদ, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি., খ. ৭, হাদীস নং- ৩৮১৪

وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن جبير على الرماة وهم خمسون رجلا وعهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير فبارز

গর্ভপাত বুঝাতে ইজহায (إجهاض)শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অনেক সময় তার সমার্থবোধক শব্দ طرح، إسقاط، إلقاء ও إملاص দ্বারাও গর্ভপাত বুঝানো হয়।[১১] এ শব্দগুলোও হাদীসে প্রায় সম-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

গর্ভপাত-এর পারিভাষিক অর্থ

(১) Illustrated OXFORD DICTIONARY তে Abortion এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে : "the expulsion of a foetus (naturally or esp. by medical induction) from the womb before it is able to survive independently, esp. in the first 28 weeks of a human pregnancy."[১৩]

(২) L B Curzon এর মতে Abortion হলো : Separation of a non-viable human foetus (q.v) from its mother"[১৪]

(৩) Oxford Dictionary of Law প্রদত্ত Abortion এর সংজ্ঞা হলো : "The termination of a pregnancy; a miscarriage or the

---

طلحة بن عثمان فقتله وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات

ইমাম বায়হাকী, *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তাহকীক : ড. আব্দুল মুতী কালাজী, ১৪০৫ হি., পৃ. ২১০

فجاسوا العدو ضربا حتى اجهضوهم عن أثقالهم وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات

১১. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৪/২০০৪, খ. ২, পৃ. ৫৬।

১২. طرح এর ব্যবহার : ইমামু বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আত-তিব্ব, অনুচ্ছেদ : আল-কাহানাহ, বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭/১৯৮৭, খ., ৫, হাদীস নং- ৫৪২৭, ৬৫০৮। اسقاط এর ব্যবহার : ইমাম নাসাঈ, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, অধ্যায় : আল-কাসামাহ, অনুচ্ছেদ : দিয়াতু জানীনিল মারআহ, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪২০ হি., হাদীস নং- ৪৮২৮। القاء এর ব্যবহার : ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : দিয়াতুল জানীন, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., খ. ৪, হাদীস নং- ১৪১১, املاص এর ব্যবহার : ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : জানীনুল মার'আহ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৬৫০৯

১৩. *Illustrated OXFORD DICTIONARY*, London : Dorling Kindersley Limited, 2006, p. 17

১৪. L B Curzon, *DICTIONATRY OF LAW*, London : Pitman Publishing, Fourth edition, 1993, p. 2

premature expulsion of foetus from the womb befor the normal period of gestation is completed".[১৫]

(৪) Britannica READY REFERENCE ENCYCLOPEDIA অনুযায়ী Abortion হলো : "Expulsion of a foetus from the uterus before it can survive on its own"[১৬]

(৫) কায়রোস্থ ভাষাভিত্তিক সংস্থা مجمع اللغة العربية-কর্তৃক প্রদত্ত "গর্ভপাত" এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :[১৭] خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع

(৬) মু'জাম লুগাহ আল-ফুকাহা অভিধানে গর্ভপাত এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :[১৮] القاء المرأة أو الحيوان حملة ناقص الخلق أو ناقص المدة

(৭) মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ আল-মানাভী বলেন :[১৯] الإجهاض اسقاط الجنين

(৮) প্রখ্যাত আইনজ্ঞ গাজী শামছুর রহমান "গর্ভপাত" এর সংজ্ঞায় লিখেছেন : "গর্ভে স্থিতি হওয়ার পর হতে গর্ভকাল পূরণ হওয়ার পূর্বে গর্ভস্থিত বস্তুকে অপসারণ করাকে গর্ভপাত বলে"।[২০]

উল্লেখ্য যে, اسقاط শব্দটি শাব্দিকভাবে اجهاض এর সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও পরিভাষাগতভাবে اسقاط শব্দটি চতুর্থ থেকে সপ্তম মাসের মধ্যবর্তী সময়ে নারীর থেকে ভ্রূণ ফেলে দেয়াকে বুঝায়।[২১]

গর্ভপাত-এর শরঈ বিধান

গর্ভপাত সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান বর্ণনার পূর্বে এ সম্পর্কে শরীয়তের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা প্রয়োজন।

---

১৫. Elizabeth A. Mortin and Jonathan Law edited, *Oxford Dictionary of Law*, New York : Oxford University Press, Sixth edition, 2006, p. 2

১৬. *Britannica READY REFERENCE ENCYCLOPEDIA*, New Delhi : Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd and Impulse Marketing (Special edition for South Asia) 2005, Volume- 1, p. 05.

১৭. ইবরাহীম মুসতফা ও অন্যান্য, *আল-মুজাম আল-ওয়াসীত*, বৈরূত : দারু আদ-দাওয়াহ : তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৪৩; সাদী আবূ জাইব, *আল-কামুস আল-ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান*, দামেশক : দারুল ফিক্‌র, ১৪০৮/১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ৭২

১৮. ডক্টর মুহাম্মাদ রওয়াস কল'আহ জী ও ডক্টর হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মুজামু লুগাহ আল-ফুকাহা*, বৈরূত : দারুন নাফায়িস, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ৪

১৯. মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ আল-মানাভী, *আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাত আত-তাআরীফ*, বৈরূত : দার আল-ফিকর, ১৪১০, পৃ. ৩৮

২০. গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৫৩৬

২১. ইবরাহীম মুসতাফা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৬

প্রথমত : মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইসলামী শরীআহ পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) অর্জন করতে পৃথিবীতে এসেছে। এসবের অন্যতম হলো, জীবন সংরক্ষণ করা।[২২] মানুষের জীবন সংরক্ষণ করা ও ধ্বংস না করার নির্দেশনা সম্বলিত অসংখ্য বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে গর্ভপাত শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য পরিপন্থী। কাজেই যা শরীয়তের উদ্দেশ্য বিরোধী তা শরীয়তে নিষিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত : ইসলামী জীবনব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো বিয়ে করা।[২৩] আর বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, বংশবৃদ্ধি করা। এ জন্যই মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে অনুগ্রহ দান করেছেন। আল্লাহ বলেন : ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا "অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।"[২৪]

বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স. তাঁর উম্মতকে অধিক সন্তান জন্মদানকারিনীদের বিয়ে করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা অধিক স্নেহময়ী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারীদের বিয়ে করো। কারণ আমি সকল জাতির উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য গর্ব করবো।"[২৫] উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, গর্ভপাতোর দ্বারা বিয়ের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না বরং উদ্দেশ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে। আর শরীয়তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিধানের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধাদানকারী কোনো কাজ শরীয়তে বৈধ হতে পারে না।

তৃতীয়ত : সাধারণত দেখা যায়, যারা গর্ভপাত করায় তাদের একটি বড় অংশ সন্তানের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের ভয়ে বা এর কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে গর্ভপাত

---

২২. ইবরাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিল ফিকহ*, তাহকীক : আবু উবায়দা মাশাহুর ইবন হাসান, আল-কাহেরা : দারু ইবন আফফান, ১৪১৭/ ১৯৯৭, খ. ১, পৃ. ৫

২৩. আল-কুরআন, ৪ : ৩; ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. মানিস তাতা'আ মিনকুমুল বা'আতা ফাল ইয়াতাযাওয়াজ ..., বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭/১৯৮৭, খ. ৫, হাদীস নং- ৪৭৭৮।

২৪. আল-কুরআন, ১৭ : ০৬

২৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন তাযভীজি মান লাম ইয়ালিদ মিনান নিসা, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যা, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং- ২০৫২

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لاَ ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ».

করে বা করায়। অথচ এরূপ ভয় আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ সম্ভবত জীবিকা দিবেন না বা দিতে পারবেন না। এ ধারণা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।" [২৬]

উল্লিখিত আয়াত ছাড়াও রিয্কদাতা হিসেবে আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রিয্ক বা জীবিকার ভয়ে গর্ভপাত ঘটানো অগ্রহণযোগ্য।

উপর্যুক্ত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা দ্বারা গর্ভপাত সম্পর্কে প্রাথমিক যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় তা হলো, ইসলামী শরীয়তে গর্ভপাত অবৈধ।

গর্ভপাত সম্পর্কে শরীয়তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

গর্ভপাত সম্পর্কিত আলোচনা কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন :

১. **প্রাকৃতিক গর্ভপাত** : সকল গর্ভাবস্থার গড়ে প্রায় ২০ শতাংশ[২৭] বা ২৫ শতাংশ[২৮] প্রাকৃতিক ভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য ব্যক্তি ভেদে ভ্রূণ বিনষ্টের হারে বেশ তারতম্য ঘটে থাকে।[২৯] কোনো গর্ভস্থিত ভ্রূণ যদি স্বাভাবিকভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং গর্ভ থেকে (স্রাবের মাধ্যমে) তা বেরিয়ে আসে তাহলে এই ধরনের গর্ভপাতকে গর্ভস্রাব বলে। এ ধরনের গর্ভপাত ব্যক্তির ইচ্ছা-নির্ভর নয় বিধায় একে স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাতও (Spontaneous Abortion) বলা হয়ে থাকে।[৩০]

কিছু সংখ্যক ফকীহ গর্ভের ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর, প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে এবং জরায়ুতে স্থির হওয়ার পরের বিধানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য হলো :

ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে এবং পরে গর্ভপাতের বিধান নির্ধারণ করার জন্য সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন যে, কখন ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় ভ্রূণ সৃষ্টির একশত বিশ দিন পর। মহান আল্লাহ ফিরিশতা পাঠিয়ে ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চার করেন। এ সম্পর্কিত হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "মায়ের পেটে তোমাদের সৃষ্টি গঠন সমন্বিত হয় চল্লিশ দিন বীর্য আকারে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ

---

২৬. আল-কুরআন, ১১ : ৬

২৭. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *সমাজ ও জনসংখ্যা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৭৪

২৮. ড. মোঃ শওকত হোসেন, গর্ভপাত : ইসলামী নীতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ৫০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১০, পৃ. ২৩

২৯. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩০. ড. মোঃ শওকত হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

দিনে তা আলাদা হয়। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে তা গোশত পিণ্ড হয়, এরপর মহান আল্লাহ ফিরিশতা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি রূহ ফুঁকে দেন"।[৩১]

ভ্রুণে রূহ ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভপাত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য আছে বলে জানা যায় না। তাঁরা স্পষ্ট করে বলেছেন, ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভপাত ঘটানো সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। তাঁরা আরো বলেছেন, নিঃসন্দেহে এটা শিশু হত্যার শামিল।[৩২]

মূলত কোনো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দলীল বা মৌলনীতি না থাকলে ইজমা সাব্যস্ত হয় না। তাই এখানে যে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে এর পিছনেও কুরআন-সুন্নাহ'র দলীল রয়েছে। ভ্রূণে রূহ ফুঁকে দেয়ার পর গর্ভপাত করাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩৩] এ ধরনের হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে"।[৩৪]

---

[৩১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়ঃ আল-কদর, অনুচ্ছেদঃ কাইফিয়্যাতুল খালিকিল আদামী ফী বাতনি উম্মিহী, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যা, তা.বি., খ. ৪, হাদীস নং- ২৬৪৩।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : বাদউল খালক, অনুচ্ছেদ : যিকরুল মালাইকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৩৬।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

[৩২] *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭।

[৩৩] সাউদ ইবনে আব্দুল আলী আল-বারুদী আল-উতাইবী, *আল-মাওসূআতুল জিনাইয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-মুকারানাহ বিল আনযুমাতিল মা'মুলি বিহা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাতিস সাউদিয়্যাহ*, রিয়াদ, ১৪২৭, পৃ. ২৫।

[৩৪] আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

সুলায়মান ইবন আমর র. থেকে তার পিতা আহওয়াস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের দিন রসূলুল্লাহ স. কে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি : "এটা কোন দিন? লোকেরা বললো, বড় হজ্জের দিন। তিনি বলেন, আজকের এ দিন ও তোমাদের এ শহর যেমন হারাম (মহাপবিত্র) তদ্রূপ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভ্রম পরস্পরের জন্য হারাম। সাবধান! অপরাধী নিজেই তার অপরাধের জন্য দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের উপর এবং সন্তানের অপরাধ পিতার উপর বর্তায় না"।[৩৫]

কুরআন-সুন্নাহ'র দলীল ও ফকীহগণের মতামতের ভিত্তিতে বুঝা গেল, রূহ ফুঁকে দেয়ার পর গর্ভপাত করা হারাম। এ বিধান এতটাই ব্যাপক যে, গর্ভ বহাল থাকলে যদি মায়ের জীবন আশঙ্কাযুক্ত হয়, তাহলেও এ বিধান আর আশঙ্কামুক্ত হলেও এই একই বিধান প্রযোজ্য।[৩৬] আল্লামা ইবনু আবেদীন র. এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে লিখেছেন, ভ্রূণ যদি জীবিত হয় এবং তা গর্ভে রাখতে গেলে মায়ের জীবন যদি বিপন্ন হয় তারপরও ভ্রূণ কেটে ফেড়ে নষ্ট করে দেয়া জায়েয হবে না। কেননা তার কারণে মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত নয় বরং ধারণাপ্রসূত। আর ধারণাপ্রসূত একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো মানুষকে হত্যা করা জায়েয নেই।[৩৭]

ভ্রূণে রূহ ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভপাতের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের ঐকমত্য থাকলেও প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাতের বিধান সম্পর্কে তাঁদের মতের ভিন্নতা পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলিমের মতে, ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত করা কোনো শর্ত ছাড়াই বৈধ।[৩৮] মালিকী মাযহাবের অনুসারী আল্লামা লাখমীর মতে, চল্লিশ দিনের কম বয়সের ভ্রূণের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটানো বৈধ ।[৩৯]

---

৩৫. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ দিমাউকুম ওয়া আমওয়ালুকুম আলাইকুম হারাম, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা. বি., খ. ৪, হাদীস নং-২১৫৯।

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثنا أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم ؟ قال فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده و لا ولد على والده

৩৬. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. ইবন আবেদীন, *হাশিয়াতু রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫/১৯৯৫, খ. ৩, পৃ. ১৯২

৩৯. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, হাশিয়া আররাহুনী আলা শারহিয যারকানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৪

শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী আবু ইসহাক আল-মারওয়াযীর মতও অনুরূপ।[৪০] হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ের গর্ভ হলে তার গর্ভপাত ঘটানো বৈধ। ইবন আকীল বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভের ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিয়ামত দিবসে পুনরায় জীবিত করা হবে না। সুতরাং এধরনের গর্ভপাত হারাম নয়।[৪১] কিছু সংখ্যক ফকীহ কৃত্রিম গর্ভপাত শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। হানাফী ফকীহগণের মধ্যে আলী ইবন মূসা র. এ মতের প্রবক্তা।[৪২] মালিকী মাযহাবের অনুসারীদেরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত করার ব্যাপারে এ অভিমত।[৪৩] ইমাম শাফিঈ র.-এর অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ আর-রামলীর মতে, রূহ ফুঁকে দেয়ার পূর্বের গর্ভপাত মাকরূহে তানযিহী ও তাহরীমী উভয়েরই সম্ভাবনা প্রবল।[৪৪] মালিকী মাযহাবের ফকীহ আল্লামা দারদীর বলেন, জরায়ুতে যে শুক্র প্রবেশ করে তা বের করে ফেলা জায়েয নেই, চাই তা চল্লিশ দিনের পূর্বেই হোক না কোনো।[৪৫] ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে কৃত্রিম গর্ভপাতের ব্যাপারে শাফিঈ র. এর অনুসারীদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, তা হারাম। কেননা জরায়ুতে ভ্রূণ স্থির হওয়ার পর আকৃতি ধারণ করে, আর তা প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীদের অভিমতও এটিই, যেমন ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন। ইবন আকীলের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট।[৪৬]

ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাতের বৈধতার বিষয়ে বৈধ-অবৈধ দু'রকমের মতামতই প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। তবে বৈধতার পক্ষের মতসমূহের থেকে অবৈধতার পক্ষের মতসমূহ অধিক প্রামাণ্য ও যৌক্তিক।

ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম দলীল হলো, গামিদিয়্যা গোত্রের যিনাকারী মহিলার হাদীস। ঘটনাটি এ রকম : বুরায়দা রা. বলেন, গামিদিয়্যা গোত্রের এক মহিলা রসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি। অতএব, আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলাটি পরদিন এসে বললো, আমাকে কেন ফিরিয়ে দিচ্ছেন?

---

৪০. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৪১. মানসূর ইবন ইউনুস আল-বাহুতী আল-হাম্বালী, *কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা*, অধ্যায়: আত-তাহারাহ, অনুচ্ছেদ : ফিন নিফাস, বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮/১৯৯৭, খ. ১, পৃ. ৩৪২

৪২. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ৫৭

৪৩. শামসুদ্দীন আদ-দাসূকী, *হাশিয়াতুদ দাসূকী আলা আশশারহিল কাবীর*, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২৬৬

৪৪. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. প্রাগুক্ত

আল্লাহর শপথ, আমি অন্তঃসত্ত্বা। একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি যখন অপরাধ লুকাচ্ছ না ও নিজের কথা থেকে ফিরছ না, এখন যাও, বাচ্চা প্রসব করার পর এসো। বাচ্চা জন্মের পর মহিলাটি নবজাতককে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে নিয়ে রসূলুল্লাহ স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, দেখুন! আমি বাচ্চা প্রসব করেছি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এখন যাও, বাচ্চার দুধ পান শেষ হলে এসো। বাচ্চার দুধ পান শেষ হলে মহিলাটি বাচ্চার হাতে রুটির টুকরা দিয়ে তাকে নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়ে বললো, দেখুন, হে আল্লাহর নবী! আমি তার দুধ ছাড়িয়েছি। এখন সে খাবার খেতে পারে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. ছেলেটিকে একজন মুসলিমের হাতে অর্পণ করেন ও তার জন্য একটি গর্ত খনন করতে বললেন। লোকেরা তার বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করলো। অতঃপর লোকজনকে পাথর মেরে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। এরপর লোকেরা তাকে রজম করলো।[৪৭]

উক্ত হাদীসে যদিও একথার উল্লেখ নেই যে, মহিলাটি যিনা করার কতদিন পর পবিত্র হওয়ার জন্য নবী স.-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল, তবে মহিলার পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে বারবার নবী স. নিকট উপস্থিত হওয়া একথার প্রমাণ বহন করে যে, ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সে হয়তো নবী স. এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। কেননা যেনা এমন চারিত্রিক ও ধর্মীয় মহা অপরাধ যা সংঘটিত হওয়ার পর লজ্জাবোধ ও অপরাধের অনুভূতি যিনাকারীকে অতি তাড়াতাড়ি এ পাপ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য অস্থির করে তোলে। আর সাহাবায়ে কিরাম তো এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, উক্ত মহিলাটি এক শত বিশ দিন পর তার অপরাধ অনুভব করেছে। এখানে দেখার বিষয় এই যে, গামিদিয়্যা মহিলাটি একাধিকবার যিনা স্বীকার করার পরও রসূলুল্লাহ স. তাকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দেননি। একমাত্র গর্ভকে সামনে রেখেই যিনার হদ্দ (শাস্তি) কার্যকর করতে

---

৪৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মান ই'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., হাদীস নং- ১৬৯৫

عن سليمان بن بريدة عن أبيه ..... قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال (وما ذاك ؟) قالت إنها حبلى من الزنى فقال (آنت ؟) قالت نعم فقال لها (حتى تضعي ما في بطنك) قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي الله قال فرجمها

এত বিলম্ব করছেন। এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, বিনা কারণে ১২০ দিনের পূর্বেও গর্ভপাত বৈধ নয়।[৪৮]

যে সব ক্ষেত্রে গর্ভপাত বৈধ

ইসলামী আইনে স্বাভাবিকভাবে গর্ভপাত অবৈধ হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে গর্ভপাত বৈধ। প্রকৃতপক্ষে হানাফী মাযহাব শুধু ওযরের ওপর ভিত্তি করে কৃত্রিম গর্ভপাতকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। ইবন আবেদীন বর্ণনা করেন, কোনো ওযর ছাড়া গর্ভপাত বৈধ নয়। ওযর ছাড়া গর্ভপাতকারী মহিলা অবশ্যই গুনাহগার হবে।[৪৯] অন্যদিকে মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে যে সকল আলিম ওযরবিহীন কৃত্রিম গর্ভপাতের প্রবক্তা তাঁদের নিকট ওযর থাকা অবস্থায় গর্ভপাত করা উত্তমরূপেই বৈধ।[৫০] শরীয়তসম্মত ওযরসমূহ কী কী তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এসব মতামতের ঐক্য সাধন বর্তমান মতানৈক্যপূর্ণ পৃথিবীতে যথেষ্ট কঠিন। তবুও আধুনিক যে কোনো সমস্যার সমাধানে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম কেন্দ্রীয় সংগঠন "রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামী (World Muslim League) এর আল-মাজমা আল-ফিকহিল ইসলামী (Islamic Fiqh Council) এর ফাতাওয়া যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। গত ১৫ রজব ১৪১০/১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ থেকে ২২ রজব ১৪১০/১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত মক্কায় অনুষ্ঠিত এ কাউন্সিলের দ্বাদশ বৈঠকে 'সৃষ্টিগত/জন্মগত বিকৃত আকৃতিসম্পন্ন গর্ভস্থ শিশু নষ্ট করা' বিষয়ে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, শর্তসাপেক্ষে দু'টি ক্ষেত্রে গর্ভপাত বৈধ।

এক. গর্ভে ভ্রূণের বয়স ১২০ দিনের বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিম যদি এ মর্মে সিদ্ধান্ত দেন যে, গর্ভাবস্থা অব্যাহত থাকলে তা মায়ের জীবনের গুরুতর ক্ষতি সাধন করবে, এমতাবস্থায় গর্ভপাত বৈধ।[৫১]

---

৪৮. মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা*, ঢাকা : সা'দ প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৪১-২৪২

৪৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. *কারারাতুল মাজমাঈল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা মুকাররমা : আল মাজমাউল ফিকহিল ইসলাম, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, পৃ. ২৭৭। এ সিদ্ধান্ত যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ক'জন হলেন, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায, ভাইস চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ উমর নাসীফ, সদস্য মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর, ড. বাকর আব্দুল্লাহ আবু যাইদ, আব্দুল্লাহ আল-আব্দুর রহমান আল-বাসসাম, সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ

এ বৈধতার পিছনে প্রমাণ হিসাবে কাউন্সিল কর্তৃক উল্লেখকৃত একটি মূলনীতিসহ ইসলামী আইনের একাধিক মূলনীতি রয়েছে। এখানে গর্ভপাতের অনুমতি বা বৈধতা প্রদানের বিষয়টি এমন নয় যে, একটি জীবনের উপর আরেকটি জীবনকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে বাস্তবতাকে মেনে নেয়া। কারণ মায়ের জীবন ধ্বংস হলে সেই ভ্রূণের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে যা করা হচ্ছে তা হলো, দুটি জীবনকেই ধ্বংস হতে না দিয়ে অন্তত একটিকে রক্ষা করা।[৫২] এখানে ইসলামী আইনের ২টি মূলনীতি প্রযোজ্য। সেগুলো হলো :

প্রথম মূলনীতি : يختار أهون الشرين
অর্থাৎ দুই ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক সহজ বা কম ক্ষতিকে গ্রহণ করা হবে।[৫৩]

দ্বিতীয় মূলনীতি : إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ দু'টি ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক ছোট ক্ষতিকে গ্রহণ করে বড় ক্ষতিকে প্রতিরোধ করতে হবে।[৫৪]

অতএব গর্ভস্থ ভ্রূণ বা সন্তানকে নষ্ট করার মতো তুলনামূলক ছোট ক্ষতি স্বীকার করার মাধ্যমে মায়ের মৃত্যুর বা গুরুতর ক্ষতির মত বড় ক্ষতি প্রতিরোধ করাই শ্রেয়।

দুই. গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স ১২০ দিনের কম হলে বিশ্বস্ত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিম যদি গবেষণাগারে (Laboratory) আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গর্ভস্থ সন্তান গুরুতর বিকৃত বা কুৎসিত আকৃতি সম্পন্ন, যা চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিকার সম্ভব নয়, আর এ গর্ভস্থ সন্তান যদি থেকে যায়

আল-ফাওযান, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল, মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা, মুহাম্মাদ মাহমুদ আস-সাওয়াফ, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. মুহাম্মদ রশীদ রাগিব র.।

إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين

৫২. প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলী, *মেডিকেল এথিক্স : ইসলামী দৃষ্টিতে*, ড. শারমিন ইসলাম ও ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০, পৃ. ৩২।

৫৩. আহমাদ ইবনুশ শাইখ মুহাম্মাদ আয-যারকা, *শারহুল কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ*, দামিশক : দারুল কলম, ১৪০৯/১৯৮৯, পৃ. ২০৩; মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারকাতী, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, করাচী : দারু সাদাফ, পৃ. ১৩৯, কায়িদাহ নং- ৪০৫।

৫৪. আশ শাইখ যাইনুল আবেদীন ইবন ইবরাহীম ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৮৯; আহমাদ ইবনুশ শাইখ মুহাম্মাদ আয-যারকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারকাতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫, কায়িদাহ নং- ১৯

এবং ঐ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার জীবন হবে খারাপ এবং তার পরিবারের জন্য চরম যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টদায়ক। এমতাবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানের পিতা-মাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে গর্ভপাত করা বৈধ। কাউন্সিল এ সিদ্ধান্ত দেয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহ ভীতি অবলম্বনের এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থা নিশ্চিত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছে।[৫৫]

গর্ভপাতের ক্ষতি ও ঝুঁকি

সুদূর অতীত কাল থেকেই বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পন্থায় গর্ভপাত প্রচলন হয়ে আসছে, তবে আধুনিক শল্য-চিকিৎসা (Surgery/Operation) পদ্ধতিতে অনেকটা নিরাপদে এটা সম্পন্ন হতে পারে। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ দেশেই এটি এখনো বেআইনী হওয়ার অন্যতম কারণ স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিণাম।[৫৬] সাধারণত ইসলামী আইন যখন কোনো কিছুকে নিষিদ্ধ বা অবৈধ ঘোষণা করে তখন তার ক্ষতির মাত্রাকে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী আইনে গর্ভপাতকে অবৈধ ঘোষণার পিছনেও এর ক্ষতির দিকটি বিবেচনা করা হয়েছে। গর্ভপাত ব্যক্তি ও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিম্নে গর্ভপাতের কতিপয় ঝুঁকি ও ক্ষতি উল্লেখ করা হলো,

(১) গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব মায়েদের প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। তবে কিছু কারণে গর্ভধারণ ও প্রসব ঝুঁকিপূর্ণ হয়। যাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালীন সময় খুব বেশি জটিলতার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ বলে। আর যাদের আগে পর পর কয়েকবার গর্ভপাত হয়েছে তাদের জন্য পরবর্তীতে গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ।[৫৭]

(২) গর্ভপাত যেহেতু একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাই এক্ষেত্রে মায়ের অতিরিক্ত রক্তপাত ও ইনফেকশন বা সেপটিক হতে পারে, যার অনিবার্য ফলস্বরূপ মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।[৫৮]

---

৫৫. *কারারাতুল মাজমাঈল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله فعندئذٍ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين . والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء وللوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر

৫৬. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৫৭. মনিরুন নেসা বেগম, *স্বাস্থ্য-পুষ্টি ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৩৯

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

(৩) গর্ভপাত যেমনি উশৃঙ্খলতার সুযোগ অবারিত করে। মানব হত্যার মত অপরাধ সংঘটিত হওয়া ছাড়াও সমাজে গর্ভপাতের সুযোগ অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সহজে এবং সুলভে গর্ভপাতের সুযোগ থাকায় মানুষ নির্ভয়ে দায়দায়িত্বহীনভাবে যৌনাচারে লিপ্ত হয়।[৫৯] আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, অবাধ যৌনাচার মানব পরিবার ও সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে পশুত্বের সমাজে রূপান্তরিত করে।

(৪) গর্ভপাত সমাজে সন্ত্রাস ও হত্যার পরিবেশ তৈরি করে। গর্ভপাত বৈধকরণের মাধ্যমে মানবজীবনের প্রতি যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় তা পরিণামে মানুষকে সহজেই জীবনঘাতি যে কোনো পন্থা গ্রহণে উসকে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণকে যারা উৎসাহিত করে তারা নিরীহ মানুষ হত্যা করতে দ্বিধা করে না। পাশ্চাত্যে ক্রমবর্ধমান সেইডিজম (যৌনসঙ্গীকে পীড়ন করে যৌন সুখলাভ) সম্ভবত এটারই ফসল।[৬০]

(৫) গর্ভপাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়।

(৬) গর্ভপাতের ফলে মহিলার প্রজনন ব্যবস্থায় (Reproductive System) প্রদাহের সৃষ্টি হয়, যার পরিণাম অনেক সময় পুনরায় গর্ভধারণ করতে অক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছায়।[৬১]

(৭) গর্ভপাত যে নারীর স্বাস্থ্য ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ব্যবস্থার জন্য ধ্বংসাত্মক, এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞই একমত। ডা: ফ্রেডিক টোমেগের মতে- "নারীর গর্ভকাল পূর্ণত্বে পৌঁছার পূর্বে যদি গর্ভস্থ ভ্রূণ স্থানচ্যুত (Abortion) করা হয় অর্থাৎ গর্ভপাত ঘটানো হয়, তা হলে মানববংশকে তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত : এক অজ্ঞাত সংখ্যক মানববংশকে পৃথিবীতে আসার আগেই হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়ত : গর্ভপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী মায়ের এক বিরাট সংখ্যা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তৃতীয়ত : গর্ভপাতের ফলে বিপুলসংখ্যক নারীর দেহে এমন সব রোগের প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।[৬২]

---

৫৯. প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলী, *মেডিকেল এথিক্স : ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৬০. প্রাগুক্ত

৬১. মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্টটিউব বেবী : ইসলামী দৃষ্টিকোণ; *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৩, জানুয়ারী-মার্চ : ২০১৩, পৃ. ৩৫

৬২. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *ইসলাম ও শিশু অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ-এর থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ-এর অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, পৃ. ১১৭

জন্মনিরোধের সকল পন্থাই মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শুধু যে চিন্তার বিপর্যয় দেখা দেয় তাই নয়; বরং যৌনক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে সুখানুভব করে থাকে সে আস্বাদটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার

প্রাচীনকাল থেকেই গর্ভনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনিরোধের উপায় হিসেবে গর্ভপাত বহুল প্রচলিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এর হারের বৃদ্ধি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রার বদৌলতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আজ আকাশচুম্বি। তাই বিভিন্ন যন্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে গর্ভে ভ্রূণের অবস্থা এবং জন্মকালে মা ও শিশুর ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা খুবই সহজসাধ্য ও হাতের নাগালে। তাই গর্ভপাতের হারও ক্রমশ বাড়ছে। অপরদিকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও এক পর্যায়ে বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চারের হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মুসলিম স্বামী-স্ত্রীদের ও তরুণ-তরুণীদেরকে গর্ভপাত সম্পর্কিত ইসলামী বিধান জানা ও মানা আবশ্যক। ইসলাম সাধারণভাবে যে কোনো পর্যায়ে গর্ভপাতকে অবৈধ ঘোষণা করলেও ইসলামী আইনের অন্যতম মূলনীতি "প্রয়োজন অবৈধকে বৈধ করে"[৬৩] (الضرورات تبيح المحظورات) এবং উল্লিখিত অন্যান্য মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ ওযরবশত ক্ষেত্র বিশেষে গর্ভপাতকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেকে আবার আযল (নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের পর পুরুষের বীর্য নারীর যৌনাঙ্গের বাইরে স্খলিত করা)কে গর্ভপাতের সাথে মিলিয়ে ফেলেন, যা সঠিক নয়। গর্ভপাতের বৈধতা নিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণের মধ্যে এবং বর্তমানকালের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও প্রয়োজনের শেষ সীমায় না পৌছা পর্যন্ত গর্ভপাত না করাই উত্তম বলে বর্তমান আলোচনায় প্রমাণ হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশীয় প্রেক্ষাপট এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক উদ্ভাবনকে সামনে রেখে বিস্তর গবেষণার অবারিত সুযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ আলিম ও চিকিৎসকগণের সম্মিলিত গবেষণা এ বিষয়ে ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে একান্ত প্রয়োজন। অবাধ ও অবৈধ গর্ভপাত যেভাবে বাড়ছে তা বন্ধে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত ও বাস্তবায়িত না হলে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত আবার নবরূপে একবিংশ শতাব্দিতে ফিরে আসবে এ আশংকা বাহুল্য নয়।

---

[৬৩] মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ বাদরুদ্দীন আয-যারকাশী আশ-শাফিঈ, *আল-মানসুর ফিল কাওয়াঈদ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫, খ. ২, পৃ. ৩১৭

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজি: নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিকহশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিকহী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয় নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবে না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000, এবং MS-word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যে ভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب–كتاب) : ..., অনুচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।

যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান: প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।

যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম, তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www.ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।

(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।

(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।

(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।

(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায়..................কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ..

....

বয়স................. পেশা...

ফোন/মোবাইল ঃ .... সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা...

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৯৫৬৭৬৭২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.com

সংস্থার একাউন্ট নং

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।

এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন

২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

⇨ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-

⇨ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-

⇨ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

REG. NO. DA 6100, ISLAMI AIN O BICHAR APRIL - JUNE 2013